নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

বাণী রায়

মুখার্জ্জী বুক হাউস
৫৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা - ৬

প্রথম প্রকাশ—

২৫শে বৈশাখ ১৩৬৫

প্রকাশক—

সুবিমল মুখোপাধ্যায়
৫৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৬

মুদ্রক—

উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস
আই. এন. এ. প্রেস
১৭৩, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট,
কলিকাতা - ৬

প্রচ্ছদপট—

চিত্র বিতান

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—

আই. এন. এ. প্রেস

দাম—

তিন টাকা আট আনা

পরম পণ্ডিত, উচ্চ সমালোচক,
নীরব সাহিত্যিক জনক
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়কে

আমার অনুপ্রেরণাদাত্রী, বাল্য
এবং রচনার সংশোধনকারিণী,
সাহিত্যিক জননী শ্রীযুক্তা
গিরিবালা দেবীকে

আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিভার জন্মদিন
পঁচিশে বৈশাখে
প্রণাম সহ—

"There's so much good in the worst of us,
And so much bad in the best of us,
It turns out that a lot of us
Can make a pretty good living writing about the rest of us."

লেখিকার অন্যান্য বই

জুপিটার

পুনরাবৃত্তি

প্রেম

শূন্যের অঙ্ক

রঞ্জনরশ্মি

সপ্তসাগর

শ্রীলতা ও সম্পা

প্রতিদিন

ঊষা-অনিরুদ্ধ ও হৃদয়ের মৃত্যু

হাসিকান্নার দিন

কনে-দেখা-আলো

বর্ষাবিজয়

ছড়ানো লেখা যতক্ষণ ছড়িয়ে থাকে ততক্ষণ তারা আমার মনোযোগ পায় না। একটি সূত্রে যখনি গেঁথে তুলতে হয় তাদের, তখনি মনে নানা চিন্তার উদয় হয়। প্রথমেই মনে পড়ে, কোন কোন পত্রপত্রিকার পৃষ্ঠায় এদের প্রকাশ, এদের জন্মলাভের মুহূর্ত। কেন লিখেছিলাম, লিখে কি ফল পেয়েছিলাম ?

এই প্রবন্ধ-সংকলনে অদেখা বিদেশের লেখকদের মধ্যে একমাত্র 'বিগতযুগের লেখক' ভিন্ন প্রত্যেকটি রচনা ফরমাসী লেখা, অতএব স্বয়ং-নিয়ন্ত্রিত। দেশের লেখকদের মধ্যেও অধিকাংশ ফরমাসী রচনা। রচনাগুলি সাহিত্যিক এবং তাঁর জীবনের আলোকে তার সাহিত্য কর্মের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আমরা সমালোচনা লিখি, জীবনী লিখি, দৃষ্টিপাত বা ইনটারভিউ করি। 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' কোন তালিকাভুক্ত হ'বেনা।

একটু অন্য ধরণের প্রবন্ধ লিখবার চেষ্টা করেছিলাম। সাধারণতঃ বাংলায় উল্লিখিত তিনটি শ্রেণী ভিন্ন ব্যক্তি বা সাহিত্য আলোচিত হয় না। দেশের লেখকদের নিয়ে আমি, বিশেষ করে, 'Profiles' জাতীয় রচনার প্রয়াস করেছি।

New Yorker পত্রিকার সম্পাদক Harold Ross তাঁর পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনীমূলক ছোট নক্সাগুলোকে প্রথম 'Profile' নামে অভিহিত করেন। তারপরে আমেরিকার অধুনাতম সাহিত্যে প্রচুর এই জাতীয় লেখার প্রাদুর্ভাব ঘটল।

Profile মানে পাশ থেকে মুখের সীমানা-রেখা দেখা, সম্পূর্ণ দর্শন নয়। অতএব সম্পূর্ণ বিচারও নয়, মোটামুটি ভাবে একটা ছবি আঁকা। বিভিন্ন ভাল ও মন্দ উপাদান থেকে প্রকৃত ব্যক্তিসত্তার পরিচয় দেবার উদ্যমকে আমরা প্রোফাইল বলতে পারি।

সাহিত্য বিচারে আমি সাহিত্যিককে জড়িত করে প্রোফাইলের প্রথায় নূতন আঙ্গিকা বাংলায় আনবার চেষ্টা করেছি। 'অভিশপ্ত গন্ধর্ব্ব' অবশ্য সাহিত্যসম্বন্ধীয় বিষয় নয়, কিন্তু যেহেতু তিনিও শিল্পী ও স্রষ্টা এবং যেহেতু লেখাটি এই পর্যায়ে পড়ে, সুতরাং এখানেই স্থান হ'ল।

বিদেশের লেখকদের জীবনে প্রেমের প্রভাব অধিক দেখানো হয়েছে। শিল্পী সৃজনক্ষণে দেবত্ব লাভ করেন, তাঁরও ঊর্দ্ধে থাকেন প্রেরণার উৎস।

আলোচ্য ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক জীবন নিঃসঙ্গ রাখেননি। কিন্তু স্রষ্টার মন চির নিঃসঙ্গ। বাইরের জগতের জনতা তাঁকে স্পর্শ করেনা, সৃষ্টির মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের মতই তিনি নিঃসঙ্গ। পরিবেশের ঊর্দ্ধে যে শিল্পী আত্মা পক্ষপ্রসারণ করে নিজের আকাশ চায়, সে শিল্পী সহস্র বন্ধনের মধ্যে চির একক; তার বেদনা, তার আনন্দ স্মরণ করে ধন্য হ'লাম।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৫। বাণী রায়

দেশে

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ যে দ্বীপে ক্ষণ-বিশ্রাম লাভ করে, সে দ্বীপে অবশ্যই তার পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকে না।

যে পথ ক্ষণজন্মারও প্রতিটি পায়ের ছাপ ধরে রাখতে পারে না, আমি সেই পথ। আমার জীবনে অনেক দুর্লভ প্রতিভার নিকটস্থ হ'বার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু সহজপ্রাপ্তির আনন্দে মূল্যবানকেও যথোচিত মূল্য দিতে পারিনি হয়তো। আজ মনে অনুতাপ আসে; জীবনানন্দ দাশের সঙ্গ যখন পেয়েছিলাম, কেন আরও নিবিড়তার সন্ধান করিনি; কেনই বা প্রত্যেকটি সাক্ষাতের খুঁটিনাটি সম্পর্কে একান্তচিত্ত হইনি? অনাত্মীয়া মহিলা হিসাবে হয়তো কম নারীই এই লজ্জাশীল ও সমাজবিমুখ কবির নিকটস্থ হ'বার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে মিশেছিলাম পুরুষের মত করেই। তাই, কবি হয়তো আমার কাছে কদাচিৎ সহজ অন্তরঙ্গতায় ধরা দিতেন। নারী সম্পর্কে তাঁর সহজাত সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে সুদূর সঙ্কোচ ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের দিনগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল না, কিন্তু গভীরতায় গাঢ় ও স্থায়িত্বে দীর্ঘ ছিল। সেই অমূল্য দিনগুলির স্মৃতি শোকতন্ময় মনে একমাত্র সান্ত্বনা। আমি তাঁর জীবনের কোন ঘটনা বা incidents সম্পর্কে অবহিত হ'বার চেষ্টা করি নি, কেবল মানুষ হিসাবে তাঁকে চিনবার চেষ্টা করেছিলাম।

স্বর্গগত জীবনানন্দ দাশ আমার বন্ধু (Institute of Education for women কলেজের অধ্যক্ষা) নলিনী দাশের ভাশুর হতেন। তিনি বিবাহের পর তাদের রসা রোডস্থ বাসা মোহিনী ম্যানসনে আমাকে [illegible] [illegible] জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ([illegible] আনুমানিক)।

নিনি জীবনানন্দের কনিষ্ঠ অশোকানন্দকে বিবাহ করেছে জেনে আমি উল্লসিত ছিলাম। সমাজবিমুখ, লজ্জাশীল, প্রখ্যাত কবি কিন্তু নিজেই আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার 'লুক্রেশিয়া' গল্প পড়বার পরে। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বাণী রায় ?"

একটু সন্দেহাকুল মনে হ'ল ওঁকে,—"হ্যাঁ" উত্তরের পর তেমনি ভাবেই প্রশ্ন করলেন, "'লুক্রেশিয়া' আপনার লেখা ?"

তিনি যেন যাচাই করে সত্যাসত্য জেনে নিতে চান। তখন আমি নবীনা লেখিকা মাত্র, কবিকে দেখে আমারই সঙ্কোচ হ'বার কথা। প্রথম আলাপ কিন্তু অত্যন্ত সহজ অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সম্পাদিত হয়েছিল।

এই পরিচয়ের প্রকৃত রূপটির মধ্যে জীবনানন্দের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তিনি নূতন লেখকদের রচনা পাঠ করতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসতেন অতি আন্তরিক ভাবে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা সত্ত্বেও সেই পত্রিকা তিনি পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী। তারপর ল্যান্সডাউন রোডের দ্বিতলে আবার তাঁর সঙ্গে পূর্ব আলাপের সূত্র টানা হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ঠিকানা ছিল তাঁর। জীবনানন্দ তখনও বরিশাল কলেজে অধ্যাপনা ছাড়েননি। ছুটিতে যাতায়াত চলছে ও ছেড়ে দেবার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। কবির মা তখন জীবিতা ছিলেন। তাঁর অতীত কবি-খ্যাতি শুনেছিলাম। কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না। তবে জানি মাতাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ছোটবোন সুচরিতা ও

ছোটভাই অশোকানন্দের প্রতি তাঁর প্রচুর স্নেহ ছিল। তাঁর পুত্র, কন্যা ও সহধর্মিনীকে বন্ধুমহলে টেনে আনার বিপক্ষে ছিল তাঁর আত্মগোপনধর্মী সত্তা। সাংসারিক তরীর হাল ধরা ছিল কবিপত্নীর হাতে। নিজের ঘরে অনেক বই নিয়ে সম্পূর্ণ সাহিত্য-পরিবেশে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে জীবনানন্দ ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন মনের মত বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা। প্রত্যেকদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে লেকের ধার পর্যন্ত ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাস তিনি কখনও ছাড়েন নি। বিকেলের পর তাঁকে বাড়ী পাওয়া শক্ত ছিল। ১৪ই অক্টোবর (১৯৫৪) লেকের পার থেকে ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেই তিনি ট্রামের ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন। ২২শে অক্টোবর হাসপাতালে তাঁর জীবনাস্ত হয়।

প্রকৃতির প্রতি জীবনানন্দের প্রবল আসক্তি ছিল, তাঁর কবিতার পংক্তির আড়ালে সেই প্রকৃতিকে ধরা যায়। হয়তো সেই প্রকৃতির আকর্ষণ নিত্য তাঁকে লেকের ধারে নিয়ে যেত। একলা যেতেন। বরিশালে তিনি বি. এ. পর্যন্ত পাঠ করেছিলেন। তখন মাঠে ঘাটে যথেচ্ছা ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। ফলে, প্রকৃতির যে রূপ-রস-গন্ধসমৃদ্ধ একটি রূপ তাঁর কাব্যে দেখা দেয়, সে প্রকৃতি আর কোন বাঙালী কবির কাছে সেই ভাবে ধরা দেয়নি। একটু নিরিবিলি—শান্ত পরিবেশ এই সহজ সরল মানুষটি পছন্দ করতেন। স্বল্পভাষী ও গম্ভীর বাহ্যতঃ হ'লেও ব্যক্তি হিসাবে জীবনানন্দ সরল-অমায়িক ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। প্রয়োজন হ'লেও তিনি কোথাও অনুনয়ের ধার দিয়েও যেতেন না। অর্থের অভাব কখনও বা ঘটলেও অর্থের লোভ ছিল না। ইংরাজীতে কলিকাতা থেকে এম. এ. পাশের পর তিনি বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে থাকাকালীন আমার সঙ্গে

তাঁর যোগ হয়। তারপরেই এক বছরের ছুটি নিয়ে কলিকাতায় স্থায়ী কাজের উদ্দেশে আসেন। তারপরে ব্যাঙ্কের কাজ নেন। 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদনায় যুক্ত থাকেন কিছুদিন। মধ্যে বাইরে ও মফঃস্বলে কাজ করতেন; যথা, খড়্গপুর কলেজ। প্রাইভেট ছাত্র পড়াতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে কিছুদিন কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত হাওড়া উইমেন্‌স্ কলেজে ছিলেন। তাঁর পুত্র সমরানন্দ দাশ, কন্যা মঞ্জুশ্রী, স্ত্রী লাবণ্য দাশ। জীবনানন্দ ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন।

এ সমস্তই তো বাইরের কথা। জীবনানন্দের ভাবে বলতে পারি, স্মৃতির গহ্বর হলুদপত্রাচ্ছন্ন। বাষ্প-উত্থিত স্মৃতিমূর্তির মুখ কখনও বিষণ্ণ, কখনও রঙ্গে উজ্জ্বল। সে মূর্তি চেয়েছিল একটু নিশ্চিন্ত অবকাশ কাব্যরচনার নিমিত্ত। জীবিকাটুকু উপার্জনের প্রয়াস ক্লান্ত করেছিল তাঁকে। যান্ত্রিক রুটীনের অঙ্গীভূত হওয়ার বিপক্ষে বিদ্রোহ ছিল তাঁর—অযোগ্যের অধীনতা ছিল অসহ্য। নিঃসঙ্গ এই বিহঙ্গ আত্মার স্বপ্ন ছিল নক্ষত্রে—নক্ষত্রে :

> "সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
> গোধূলির মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে !"
>
> (অনেক আকাশ)

অবসর, লেখার জন্য অবসর কামনা ছিল তাঁর। তিনি পছন্দ করতেন সাহিত্যিক পরিবেশ ও নির্জনতায় লেখার মেজাজ তৈরি করা ও সাহিত্যপঠন। ছাত্রের মত অধ্যয়ন তাঁর কাম্য ছিল। মনের রূপ ছিল অনুসন্ধানী; প্রতিটি বস্তুর, বিশেষতঃ বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের যথার্থ রূপ ধরবার প্রয়াস ছিল তাঁর। পড়তে তিনি ভালবাসতেন। ইংরাজি সাহিত্যের কোন কোন বই তাঁকে ধার দিয়েছিলাম। মনে আছে দুটি নাম শুধু, মমের 'থিয়েটার' উপন্যাস

ও ক্রোনিনের 'দি ষ্টার লুক্‌স্ ডাউন' উপন্যাস তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের উপন্যাস ও কবিতার আলোচনা করতে চাইতেন। জর্মান লেখক টমাস্ ম্যানের রচনাকে তিনি আধুনিক উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন! সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা ও এলিয়টের কবিতায় জীবনানন্দের অনুরাগ দেখেছিলাম। একটু প্রাচীন কবি, যথা মধুসূদন ইত্যাদির কবিতা তাঁর ভাল পড়া ছিল না। ইংরাজি গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা কন্টিনেণ্টাল গল্প-উপন্যাস তিনি বেশী পড়েছিলেন। সমস্ত সাহিত্য-আলোচনার মূল স্বর দেখতাম নিজের মতকে তিনি আমার মতেরও ভিত্তির উপর রাখিতে চাইতেন। অন্যের কাছ থেকে নিজের সত্যকেও যাচাই করে নেবার এক প্রবৃত্তি।

কতকগুলো জাগতিক বিষয়ে দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় হলেও জীবনানন্দ অন্তরঙ্গ ও সমধর্মী বন্ধুদের কথা উপেক্ষা করতেন না। পিতা সত্যানন্দ দাশ ধর্মপরায়ণ শিক্ষক, মাতা কুসুমকুমারী দাশ কবি। সন্তানের মনে শুচিতাবোধ ছিল প্রবল, রুচি ছিল মার্জিত। কিন্তু, মনের গতি সেই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সীমায়িত হয়ে রুচিবাগীশের কলমে কিছু কবিতা লিখে ক্ষান্ত হয় নি। মাতার উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন কাব্যক্ষেত্রে। কিন্তু, মাতা যখন লিখেছেন :

"বিপাসার তীরে ওঠে রবি"

পুত্র লিখেছেন :

"গেছে বুক-মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ,—নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে!"

(পিপাসার গান)

স্পর্শ-স্বাদ-গন্ধে ভরা একটি জগতে কবি প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে নৈতিক ধর্মশাসন ব্যর্থ। প্রি-রাফেলাইট কবি সুইনবার্ণের সঙ্গে অনেকে তাঁকে তুলনা করেছেন। আমরা আমাদের দেশের কোন লেখককে যতক্ষণ না বিদেশী মানদণ্ডে মাপ করতে পারি, স্বস্তি পাই না। জীবনানন্দ যে তাঁর নিজের মত, একথা বলতে আমাদের বাধে।

প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীন পরিবেশ রচনায় বাংলা-সাহিত্যে জীবনানন্দের সমতুল্য ছিলেন গল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুলনীয় জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন কখনও পৃথক হ'লেও সাদৃশ্য প্রচুর। প্রাকৃতিক বা গ্রামীন পটভূমির যে সমস্ত অজানা, অচেনা বস্তুপুঞ্জ ইতিপূর্বে কারুব ভাবদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি, তাদের অন্তরঙ্গ রূপ আমরা প্রথম দেখলাম কবিতার মাধ্যমে ঃ

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যাব আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;"
('মৃত্যুর আগে')

সাম্প্রতিক কবিতার সঙ্গে তুলনায় কবিতায় ভাষার পুরাতন কোন লক্ষণ দেখা যাবে। জীবনানন্দের মত ছিল, কোন বাঁধাধরা নিয়ম অবলম্বনে কবিতা লেখার অনুশাসন স্থাপন না করা। 'করেছি' সহজ কথ্য ভাষা, কিন্তু 'করিয়াছি' যদি কলমে আসে তা'হলে তাই রাখা উচিত। 'মিল' সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে।

প্রাচীন পদ্যের ভাষাও ছুৎমার্গের প্রথায় সর্বতো বর্জনীয় নয়। 'লয়ে' কথাটির ব্যবহারে জীবনানন্দের মত ব্যক্ত আছে, ক্রিয়াপদও উদ্ধৃত পংক্তিগুলির সাধুভাষায়। আধুনিক কাব্যের যিনি জনক ছিলেন, তাঁর কবিতায় আর যা হোক আঙ্গিকের দিক থেকে হাস্যকর কৃচ্ছ্রসাধন দেখা দেয়নি। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে আবেগের স্থান সঙ্কীর্ণ হয়ে গেলেও কবি আবেগধর্মী কবিতায় বিশ্বাসী ছিলেন।

জীবনানন্দের কাব্য-সমালোচনা নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। মানুষ হিসাবে তাঁকে যে ভাবে দেখেছি, সেই সূত্র ধরে অনিবার্য কাব্য-স্মরণ মাত্র। কবি মায়ের মুখে বরিশালের লৌকিক ছড়ার উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন শৈশবে। সে সব ছড়ায় অবশ্যই প্রাকৃত বাংলার ঘনবুনানি ছিল। তাই বোধ হয় কবি বন্য ভাষায় তাঁর স্বপ্নচারী সুদূর কবিতার মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করতেন:

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই —"

অথবা

"ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;"

('অবসরের গান')

"মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল— "

('পিপাসার গান')

"মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে
তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে"—

('ক্যাম্পে')

এই অভিনবত্ব সর্বত্রই যে রুচিকর হয়েছে, তা নয়। কবিতায় অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বর্বর আদিমতা জানিয়েছে কথ্য ভাষার মিশ্রণ ও সিমেন্টের মত কবিতার গাঁথুনী পাকা করেছে অবলীলাক্রমে। এ

ক্ষেত্রে কথার ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামত কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞাতব্য।

জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্যতা আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন ভাল কবিতা কি বহু সময়ে তাই নয়? সহজবোধ্যতাই সাহিত্যে উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ইদানীং কবি যে সমস্ত কবিতা লিখছিলেন, তাদের মধ্যের চিন্তাধারার যোগসূত্র পাঠকের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কখনো সাংবাদিকের প্রথায়, কখনো দার্শনিকের তন্ময়তায় কাটা-কাটা কথা সাজিয়ে গেছেন। অবচেতন মনে তাঁর চিন্তাধারার সংযোগ অবশ্যই ছিল; লিখিত পংক্তিগুলির অর্থ তাঁর নিজের কাছে সহজ। কিন্তু, পাঠক বিপন্ন হ'ন। তাই জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি সহজ নয়। ভাল করে না বুঝে পাঠ করলে সে কবিতার অন্তর্নিহিত সঙ্গীত ও তাৎপর্য প্রতীয়মান হয় না। আবার ভালভাবে পাঠ করতে সক্ষম হ'লে বিরুদ্ধবাদীর মনও অর্থনির্ণয়ের পর আপ্লুত হয়ে যায়। এটি পরীক্ষিত সত্য।

জীবনানন্দকে একদিন বলেছিলাম তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য। তিনি তাঁর অভ্যস্ত রঙ্গ-ভঙ্গিমায়, প্রতিবাদ জানালেন। আমি কিছু না বলে দ্বিতল থেকে তাঁর একটি নবতম প্রকাশিত কবিতা নিয়ে এসে ওঁর হাতে দিয়ে বিনীত অনুরোধ জানালাম, "দয়া করে এটি একটু বুঝিয়ে দিন না।" আমার পূর্ব থেকেই ইচ্ছা ছিল ওঁর কবিতাব অংশবিশেষ ওঁর কাছ থেকে বুঝে নেব।

জীবনানন্দ লজ্জিত, অপ্রতিভ হ'লেন। নিজের কবিতা যেন গোপন বস্তু, কোন মতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আলোচ্য নয়। অত্যন্ত অপ্রস্তুত মুখে তিনি নাগপাশ মোচনপ্রয়াসী ব্যক্তির আকুলতায় বলে উঠলেন, "আজ থাক। পরে একদিন হ'বে।"

সেই মুহূর্ত্তে তাঁর আত্মার একটি বিশেষ রূপ আমার চোখে পড়ল।

আত্মগোপন। তিনি যে কবি, এই শোচনীয় ঘটনা বাইরের লোকের কাছে যেন তুলে ধরার নয়। সাহিত্য-আলোচনা ও মনুষ্য চরিত্র দর্শন কাম্য হ'লেও নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কবিতা নিয়ে কবিরূপে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হ'বার বাসনা তাঁর ছিল না। তাই সভা ও সভার ফুলের মালা তাঁকে খুঁজে পায় নি। তিনি লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কখনও কোন সভায় নিয়ে যাওয়া যেত না তাঁকে। তাঁর কণ্ঠে তাঁর কবিতার আবৃত্তি অপূর্ব সুন্দর ছিল। কণ্ঠ তাঁর গম্ভীর পুরুষোচিত, যুক্ত হয়েছিল আবেগ। রেডিওতে তাঁর কাব্যপাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কি অপরূপ মূর্ছনা ও আবেগে সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর স্পন্দিত হয়ে উঠত। তখন বোঝা যেত, মাত্র তখনই বোঝা যেত, জীবনানন্দ দাশ কত বড় কবি। সেনেটহলের (২৮শে জানুয়ারী ১৯৫৪) কবি-সম্মেলনে পঠিত 'বনলতা সেনে'র শেষ লাইন দু'টি আজও কানে বাজছে :

> "সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায়
>
> এ-জীবনের সব লেনদেন ;
>
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

শ্রোতার বারম্বার অনুরোধে বিশাল সেনেটহলের ব্যাপ্তি মন্থন করে গভীর আবেগধর্মী কণ্ঠ একটির পর একটি কবিতা পাঠ করে যাচ্ছিল। জীবনানন্দ যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি, নিঃসন্দেহে সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল।

জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহুল পঠিত রচনা। আজ তরুণ কবিদের মধ্যে শতকরা আশিজন জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কবিতা লিখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পুস্তকগুলির বহু সংস্করণ হয়েছে। যখন সাধারণ তাঁকে চিনতে সুরু করেছে ও তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উৎসুক হয়ে উঠেছে, তখনি তাঁর ঘটলো অকালমৃত্যু।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের যুগ অত স্বপ্নাভারাতুর রূপকথার রাজকন্যা নয়। 'ঝরা পালক' ছিল কবির প্রথম কাব্য-পুস্তক—স্বকীয়তা প্রাপ্তির পূর্বে নকলনবীশ রচনা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অন্য এক জগতের চিহ্ন রেখে গেল জীবনানন্দের কাব্যধারায়। প্রেমের ব্যথার মধ্যে কবি নিজেকে খুঁজে পেলেন, আর খুঁজে পেলেন পরিচিত জগতের নূতন রূপ।

"জীবনের পরে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বার বার যার ইসারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁদে কেঁদে ছিঁড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে ভেসেছে সে—
বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায়!"

সমস্ত জীবনে তাঁর লেগেছে ম্লান গোধূলীর আলো, বিষণ্ণ হেমন্ত। তাঁর কবিতার বিষাদ ও বেদনাবোধ তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। সমগ্র কাব্য আচ্ছন্ন করে বাজে:

"আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;"

('আট বছর আগের একদিন')

জীবন ও মৃত্যুর ঘন বুননের মাঝে মাঝে দূরের আকাশের ক্ষণদৃশ্য কবিকে উদাস করে দিত। বিরাট পটভূমিকায় সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য। অনেক দূরের দেশে অনেক বড় অতলে

ছোট কবিতা হারিয়ে যেত। বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনের জন্ম-মৃত্যুর রহস্য আড়ালে এক ও অখণ্ড—

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,"—

(বনলতা সেন)

জীবনানন্দের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এক ধরণের ধী-নির্ভর হিউমার। দারুণ রোমান্টিক এই কবির লজ্জাজড়িত স্বল্পভাষণ এবং নিঃসঙ্গ স্বভাব বিভক্ত হ'ত চমৎকার হিউমারের অনুশীলন ও ইঙ্গিতে। তাঁর সঙ্গে আমার কথার যোগ ওখানেই ছিল—অল্প কথায় বুঝে নিতে পারা যেত পরস্পরের বক্তব্য ও হাস্যের সেতুবন্ধ রচিত হ'ত নিমেষমাত্রে। এই শ্রেণীর হিউমার বর্জিত লোকদের আমরা 'the other type' বলতাম। কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসায় আমি অর্থবাচক প্রশ্ন করতাম, "উনি কি—?" জীবনানন্দ তার চির অভ্যস্ত বক্র-হাস্যে উত্তর দিতেন, "unfortnnately, the other type!"—একটুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে অন্যের দিকে চেয়ে উনি তার মুখে সায় খুঁজতেন, তারপর হঠাৎ অতি উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। তাঁর হিউমার অন্যে ঠিকমত বুঝতে পারল কি না যাচাই করে নেওয়ার পরে তবেই তাঁর দুর্লভ উচ্চহাস্য শোনা যেত। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ সর্বদাই নিজের পালকের পাখি খুঁজতেন নিঃসংশয়ে।

জীবনানন্দের চরিত্রের এই দিকটি লক্ষ্য করে আমি একদিন প্রস্তাব করলাম, "আসুন না, আমরা একটা বৈঠক খুলি। আমাদের মত লোক বেছে বেছে অল্পসংখ্যক নেব। কথা বলে বাঁচা যাবে।"

জীবনানন্দকে প্রকৃতির কবি বলা হয়। সহজ শিশুসুলভ সারল্য তাঁর ছিল। কোন কিছুতে তাচ্ছিল্য বা অবিশ্বাস আমি তাঁর

দেখিনি। বন্ধুজন সমক্ষে উৎসাহ, নূতন কিছুতে কৌতূহল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তিনি হাসিমুখে আমার কথা স্বীকার করলেন। উৎসাহিত হয়ে বলে চললাম, "এই বৈঠকের নাম দেওয়া যাক Kit-Kat Club, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডে যেমন Kit-Kat Club প্রসিদ্ধ হয়েছিল, তেমনি আমাদের এই Kit-Kat Clubও প্রসিদ্ধ হয়ে উঠবে।"

জীবনানন্দ সপ্রশংসভাবে উচ্চহাসির সঙ্গে আমার খেয়ালকে অভিনন্দিত করলেন। তাঁর প্রবীণ বয়স, নিভৃত গম্ভীর সত্তা যেন এই খেয়ালগুলিকে মর্যাদা দিতে একবার কুণ্ঠিত হ'ল দেখলাম। কিন্তু, পরক্ষণেই তিনি নব উদ্যমে সায় দিলেন। আমরা বেছে বেছে কয়েকটি নাম নিজের মধ্যে আলোচনা করলাম, যাঁদের সদস্য হতে আহ্বান করা হ'বে।

Kit-Kat Club অষ্টাদশ শতাব্দীতে রেষ্টোরেশন যুগের সভ্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে উনচল্লিশজন প্রতিভাশালী স্বনামধন্য ব্যক্তি একত্রিত হয়ে এই বৈঠকের সৃজন করেন, (১৭০০—১৭১০), নাট্যকার উইলিয়ম কনগ্রীভ ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। দ্বিতীয় চার্ল্‌সের সময়ে ইংলণ্ডে নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে যে প্রতিক্রিয়াশীল উজ্জ্বল সভ্যতা দেখা দেয়, 'কিট্-ক্যাট'এ তারই প্রতিফলন হয়েছিল।

আমাদের এই অখ্যাতনামা কিট্-ক্যাট ক্লাব সেদিন দুইজনের কথার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'লেও সদস্যসংখ্যা তার দুইজনের অধিক হয়নি। কয়েকজন সাহিত্যিক ও বোদ্ধাকে এ বিষয়ে সংবাদ দিয়েছিলাম, তাঁরা উৎসাহও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু আমারি উদ্যমের অভাবে গড়ে তোলা হয়নি। আজ আর দুঃখ নেই। রেষ্টোরেশন যুগে যদি Kit-Kat Club বিদগ্ধজনের মিলনক্ষেত্র হয়েছিল, আমার

এই Kit-Kat Clubও শূন্য ছিল না, কারণ কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন আমাব খেয়ালসৃষ্ট অনামা বৈঠকের সহযোগী।

আমার বাড়ীব জনসমাগমহেতু নির্জনতাপ্রিয় কবি কদাচিৎ এখানে আসতেন। যখনই আসতেন আমবা দুরূহ বা জটিল বিষয়ের আলোচনায় মগ্ন হয়ে যেতাম। পরিহাস করে সেই দিনগুলি আমি Kit-Kat Club এর অধিবেশন বলে আনন্দ পেতাম। একদিন ঈশ্বরেব অস্তিত্ব নিয়ে আলোচনা হল এবং অবশেষে বেলা দু'টো বেজে গেলে অগত্যা সভা ভঙ্গ করতে আমবা বাধ্য হলাম। সেই Mighty Atom আমাদের মানবিক যুক্তিতর্কজালে ধরা দিলেন না। অযথা আহারের সময় উত্তীর্ণ করে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কবিকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কিট-ক্যাট ক্লাবের মাত্র দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন আজ নেই। অপ্রতিষ্ঠিত, অজ্ঞাতকুলশীল, হাস্যজনক শিশু প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অন্য সদস্যের যে শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশ করা সমীচীন, আমি কাগজ কলমে আজ সেই কর্তব্যই পালন করতে উদ্যত হয়েছি।

মানুষ ও কবি জীবনানন্দ কখনও অভেদ, কখনও পৃথক। তাঁকে খুঁজে চিনে নিতে হ'ত—তাঁর কবিতাকেও। রেষ্টোরেশন যুগের নীতিবর্জিত বঙ্কিম বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনার উপজীব্য নয়, কিট্-ক্যাট্ ক্লাবের কন্‌গ্রীভ অথবা সুইফ্‌টের পথাবলম্বী বাঙালী কবি জীবনানন্দ ছিলেন না। কিন্তু, তবু তাঁকে কেন্দ্র করেই বিংশ শতাব্দীর বাংলায় কিট্-ক্যাট্ ক্লাব গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। যদি সেই বৈঠক পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারত, তাহ'লে আমাদের মধ্যমণি ইংলণ্ড গগনের উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ অপেক্ষা হয়তো অধিকতর শোভমান হ'তেন। তিনি [illegible] [illegible] শিশু, [illegible] কবি। মস্তিষ্কে তাঁর মিল ছিল ওই কিট্-ক্যাট্ ক্লাবের বিদগ্ধ-মনীষীদের সঙ্গে।

তিনি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আধুনিক কবি নিঃসন্দেহে। তরুণ কবিকুল তাঁর অনুসারী। তবু মনে হয়, তিনি যদি সত্য Kit-Kat Clubএর সদস্যদের মত সমধর্মী ও বোদ্ধা বন্ধু পেতেন! কয়জন আমরা তাঁকে বুঝতে পেরেছিলাম?

স্বাভাবিক রঙ্গবোধে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ সাহিত্যে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন—তাঁকে গালাগালি সত্ত্বেও। একদিন আমরা 'শনিবারের চিঠি'র হিউমার নিয়ে আলোচনারত ছিলাম। সম্পাদক জীবনানন্দ দাশকে সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করতেন। অথচ জীবনানন্দের তাতে কৌতুকের অন্ত ছিল না। আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, "বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। সজনীবাবু আপনার যে পাব্লিসিটি করছেন, সেজন্য তিনি ফী চাইতে পারেন।"

"ঠিক বলেছেন।"

"একদিন আলাপ করবেন? অত হিউমারের ভক্ত আপনি।"

"হ'বে, হ'বে।"

সেইদিন বিদায়কালে জীবনানন্দ দাশ বলে গেলেন অনাবিল আনন্দের সঙ্গে—"সজনীবাবুকে বলবেন, এমনি ভাবেই যেন আমার আরো প্রচার করেন। হা, হা, হা!" সেই হাসির প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বলে দিল, লুকোচুরি খেলায় সজনীকান্তের হার হয়েছে। প্রকৃত ব্যক্তি যে, তিনি চিরপলাতক। ছায়াকে বিদ্রূপের বাণবিদ্ধ করবার চেষ্টায় জীবনানন্দকে বিন্দুমাত্র আঘাতও কোন সমালোচক দিতে পারেন নি।

কদাচিৎ, কোন মুহূর্তে হয়তো জীবনানন্দের বাহ্য ব্যবহারের কোন অংশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহ্য ব্যবহারের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষিত হ'ত। কিন্তু, বিভূতিভূষণ গল্পশিল্পী—তাঁর বাহ্য ব্যবহার

কখনও বা অভিনেতাসুলভ ছিল, রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতম আলোকসম্পাতের স্থানটি অধিকারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'ত। আর, জীবনানন্দ ছিলেন অন্ধকারতম কোণটুকুর প্রত্যাশী। তাই তাঁর উদাসীনতা বা নির্জন প্রকৃতি-প্রিয়তা বা সরল অনাড়ম্বর আরও অনেক হৃদয়স্পর্শী। তবু, রচনার দিক থেকে গদ্য ও কাব্য-সাহিত্যে এই দুই শিল্পীর অবদান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা চলে।

জীবনানন্দ সম্পর্কে সহজ কতকগুলি বিশেষণ আমরা পাই—তাঁর কবিতা চিত্রকল্প, তিনি হেমন্তের কবি। তিনি উপমাবিলাসী। দৃশ্য জগতকে শুধু চিত্রকল্পে অঙ্কিত করে তিনি ক্ষান্ত নন, অন্য দৃশ্য-জগতের সঙ্গে তাকে উপমায় প্রতিষ্ঠিত করে তবে যেন তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট হ'ত। 'মত' কথাটির বহুলব্যবহার তাঁর কাব্যে বিশেষত্ব, কখনও বা মুদ্রাদোষ। এখানেও স্বভাবগত যাচাই করার অভ্যাস দেখা যায় :

"আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মত কেঁপে ওঠে !
বীণার তারের মত কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ !
অসংখ্য পাতার মত লুটে তারা পথে পথে ছোটে,—
যখন ঝড়ের মত জীবনে এসেছে আহ্বান !
অধীর ঢেউয়ের মত—অশান্ত হাওয়ার মত গান
কোন্ দিকে ভেসে যায় !"

('জীবন')

লক্ষ্যণীয়, পংক্তিগুলি পাশাপাশি। কিন্তু, এখানে মুদ্রাদোষ মাধুর্য-রচনায় ব্যাঘাত ঘটায় না। জীবনানন্দের কাব্যে এক কথা বারবার ব্যবহার আছে, শিথিল আলস্যে নয়। তিনি কখনই শিথিল কবি ছিলেন না। সঙ্গীতধর্মী তাঁর এই কবিতাগুলি বারবার এক শব্দ, এক ধ্বনি দিয়ে গানের ধুয়া সৃষ্টি করে থাকে। নূতন পথের পথিক

ছিলেন কবি। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিপরীত পথে আজ পর্যন্ত যত আধুনিক কবি চলে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বকীয়তাসম্পন্ন কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাস। আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের আমূল পরিবর্তন সূচিত হ'ল তাঁর নিঃসঙ্গ মনের নিজধর্মে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। চিন্তার গতি তাঁর ছিল ভিন্ন, অসাধারণ ও বঙ্কিম। লাজুক, স্বল্পভাষী, নির্জনতার কবি কিন্তু নিজের চিন্তাধারার যথাযথ ও অবাধ বহিঃপ্রকাশে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সাহস কেবলমাত্র যুগস্রষ্টার থাকে। বিদ্রূপ, অনাদর, উপদেশ কিছুই তাঁকে নিজের পথ থেকে স্খলিত করে সহজগম্য পথে চালাতে পারে নি। তিনি নিজে যা ভাল বুঝেছিলেন, সেই পথে একনিষ্ঠ ছিলেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর মানসিক শক্তি অনুকরণযোগ্য। সাম্প্রতিক কবিতার তিনি ছিলেন জনক। তাঁর কবিতার প্রথম যোগ্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। পুনরাবৃত্তি, উপমা, পংক্তির অসামঞ্জস্য, আরও নানারূপ প্রক্রিয়া অভূতপূর্ব ভাবপ্রকাশের জন্য কবিকে ব্যবহার করতে হয়েছে। ইচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি তাঁর বিশেষত্ব। কতকগুলি সংজ্ঞা কবিচিত্তের গভীরে এমন স্থায়িত্ব নিয়ে বসে ছিল যে নানা কবিতার মধ্যে তাদের পুনঃপুনঃ প্রকাশ মনকে বিস্ময় বা অভিনবের আস্বাদে চকিত, উত্তেজিত করে তোলে না। ক্রমাগত পাই—চিল, পাখি, হরিণ, প্যাঁচা, বেতফল, ধান, শস্য, ঘ্রাণ, সমুদ্র, জল, আকাশ, মানুষী, মাংস, ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে কবিমেজাজের প্রকাশ। সমস্ত কবিতা যে বিষণ্ণ-মধুর লোকে প্রয়াণ করতে চায়, সেই লোকের পরিবেশরচনায় কথাগুচ্ছ নিঃসন্দেহে সাহায্য করলেও কবিমনের কখনও স্থাবরবৃত্তির পরিচায়ক।

নিজের জগতে নিমগ্নচিত্ত কবির মৌলিক প্রতিভার বাহন যে আঙ্গিক বা ভাষা হয়েছিল, ইংরাজি কবিতার স্বাদবঞ্চিত বাঙালীর কাছে

হয়তো বা কখনও অর্থহীন প্রতিপন্ন হ'তেও পারে। যথা, 'ঘ্রাণ' কথাটি কবি প্রায় সর্বদা ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করেছেন। শব্দগঠনও বহুলপরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত। বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র।

অতিরিক্ত সমাজ-সচেতন সমালোচক জীবনানন্দের লিরিকশ্রেণীর কবিতায় বর্তমান জগৎ থেকে পলায়নী প্রবৃত্তি দেখতেন ও আধুনিক সমাজের কোন প্রতিফলন না দেখে অতৃপ্ত থাকতেন। ইদানীং-রচিত কবিতায় জীবনানন্দের মধ্যে কবিচিত্তের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের যোগসাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর কাব্য অন্য জগতের সন্ধানে ভ্রাম্যমান হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বসপ্তাহে রেডিওতে পঠিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটির প্রশ্ন শেষ করে যেতে পারলেন না কবি।

মানুষ হিসাবে জীবনানন্দকে দেখা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ছিল। তাই কাব্যের পংক্তি স্বতঃই মনে এসেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমার প্রিয় পুস্তক, তাই বেশী উদ্ধৃতি ও-বই থেকেই। বিগত পূজাসংখ্যায় (১৩৬১) যে কবিতাগুলি ছিল, তারা পরীক্ষামূলক প্রধানতঃ—

"তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকুলসীমা আলোর মত ;—হয়তো সত্য আলো।"

(অবিনশ্বর, শারদীয়া পূর্বাশা)

সুতরাং সঠিক মতামত সহজসাধ্য নয়।

যে আবেগ পূর্বতন কাব্যের প্রাণ ছিল, ইদানীং রচিত কাব্যে সেই আবেগ আস্তে সরে যেয়ে প্রত্যক্ষ ও বর্তমান জগতকে স্থান দিচ্ছিল। প্রেম কখনও প্রতিপাদ্য হ'লেও করুণ-গম্ভীর আত্মসমর্পণ নয়। জগতকে বাইরে রেখে মনে দ্বার দেওয়া নয়।

অথচ, জীবনানন্দের নির্জনতাপ্রিয়তার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল এই যে,

শহরের প্রাণকেন্দ্রে তিনি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর গ্রামীন কবিতা সত্ত্বেও এই দিক থেকে মানসিক প্রবণতা নাগরিক ছিল। যেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি নেই, সেখানে শুধু প্রকৃতি অথবা নির্জনতা নিয়ে তিনি থাকতে পারেন নি। অনেক লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গতা তাঁর ধর্ম ছিল। আমার বাড়ীতেও জনসমাগমহেতু তিনি আসতেন কম।

সেদিন শবযাত্রার দিন দেখলাম অসংখ্য শাদা ফুলে-ছাওয়া তাঁর শরীর,—আমার হাত শূন্য। দুটি দিন মনে পড়ল। স্মরণীয় তারা। ওঁর বাড়ী থেকে সন্ধ্যাবেলায় জীবনানন্দ আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পথে ফুলের দোকান। শাদা বেলফুলের মালা কিনলাম। কবি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও এই মত। টেবিলে জল দিয়ে সাজিয়ে রাখলে অনুপ্রেরণার মত একটা কিছু—", হাসতে হাসতে তিনি উপহৃত মালা পকেটে তুলে রাখলেন সযত্নে।
আরও একদিন কবির সঙ্গে ফিরবার পথে একঝাড় রজনীগন্ধা কিনলাম। বাড়ীতে কলসীতে সাজালাম কবির সম্মুখে। আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত ও সদ্য-রচিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার কথা চলছিল—অন্য ধরণের কবিতা—বন্য প্রেমের। তিনি আগ্রহসহকারে সবগুলিই শুনলেন ও বারবার অনুরোধ করলেন সেগুলি প্রকাশিত করতে। ফুলের গন্ধ যে পরিবেশ রচনা করে, সেদিনও কবি আলোচনা করলেন নিজের পুষ্পপ্রীতি প্রদর্শন পূর্বক। জীবনানন্দ যে কত বড় ও কত আন্তরিক কবি সেদিন অনুভব করেছিলাম আমার কবিতার প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপরে দেখে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণ করছি, আমার কাব্যপুস্তক 'জুপিটার' তিনি সমালোচনার্থে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর হাতে দিয়ে এসেছিলেন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে পারে দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করে-

ছিলেন। 'পূর্বাশা'য় আমার 'সপ্তসাগর' বইখানির সমালোচনা করবেন নিজে এই ইচ্ছায় তিনি নিজে থেকে বইখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। সময়াভাবে হয়ে ওঠে নি। উনি বাসস্থানের গোলমালে বিব্রত ছিলেন। তবু অপার কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণ করছি।

সেনেটহলের কবি-সম্মেলন থেকে আমরা একসঙ্গে ফিরছিলাম। পথে অনেকক্ষণ উদাস নীরবতায় আকাশ লক্ষ্য করে অবশেষে কবি সহসা বলে উঠলেন, "আপনার সেই কবিতাগুলো? ছাপা হ'লে আমাকে কিন্তু এক কপি দেবেন।"

বুঝতে পারলাম, তাঁর মনে সর্বদা কবিতার সুর বাজে। আমার যতটুকু মূল্য তাঁর কাছে, সেটুকু আমি কবিতা লিখি বলেই, সাহিত্যিক বলেই। অনেক লোকের কোলাহল-মুখরিত নগরে ইনি তো নিজের নিঃসঙ্গ কাব্যজগৎ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন! এই যে চারপাশে ট্রাম-বাস, লোকজন, কিছুই ওঁর চোখে পড়ছে না, মনেও প্রবেশ করছে না। অথচ, উনি তো কলকাতায় থাকতেই ভালবাসেন। কবিধর্ম কিন্তু নির্জন পল্লীর স্বপ্নে মগ্ন! তবে?

বুঝতে পারলাম, কবি নাগরিক জনতার মধ্যে থাকতে ভালবাসেন কারণ জনতা সময় বিশেষে চমৎকার আড়াল রচনা করতে পারে। জনতার অন্তরালে নিজেকে আবৃত করে লুকিয়ে থাকা চলে। মফঃস্বল শহরে ব্যক্তির যে আড়াল থাকে না, তিনি প্রকট হয়ে পড়েন।

সেই পুষ্পসমাকুল দিন দুইটি এই খানেই শেষ হয়ে গেল—এই শবযাত্রার বেলরজনীগন্ধার স্তূপে! সেখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয় নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হ'ল, জীবনানন্দ একদিন কি সতৃষ্ণভাবে বলেছিলেন, "আপনার বাড়ীটায় যদি থাকতে পারতাম

তবে কি ভালভাবেই না লিখতে পারতাম! লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কি লিখবার আছে। আপনার ঘরটি যদি পেতাম!"

সে দিন যে উত্তর দিয়েছিলাম, মনে বিস্তৃততর হয়ে ফিরে এল : যে সাহিত্যিক নিজের অক্ষমতা পারিপার্শ্বিক-নির্ভর মনে করতে পারে না, তার যন্ত্রণা যেন আপনার কখনও অনুভব করতে না হয়। প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যদি প্রেরণাবিহীন প্রতিভার অবসাদ বহন করতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জীবনানন্দ অবসাদের পূর্বেই বিদায় নিতে পেরেছেন।

অভিশপ্ত গন্ধর্ব্ব

তাঁকে জীবনে একবারই দেখেছিলাম। দেখেছিলাম বহুবার বহু ব্যক্তিত্বের মধ্যে আত্মগোপনকারী অভিনেতাকে। অনেক দূর থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় দেখেছিলাম দূরের মানুষকে। কিন্তু, কাছে দেখা সহজ স্বাভাবিক রূপে মাত্র একদিন।

টেলিফোন বেজে উঠল সন্ধ্যাবেলায়। আমার ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট কামরায় টেলিফোন। সদ্য এম. এ. পাশ বেকার জীবন। বাড়ীতেই ছিলাম। টেলিফোন ধরলাম।

"হ্যালো, এটা কি পূর্ণ থিয়েটার?" আমার বাবার নাম, 'পূর্ণচন্দ্র রায়' কথাটাই ভুল করে বুঝে বললাম নিশ্চিন্ত মনে, "হ্যাঁ।"

সেই একটু গভীর অথচ মধুর পুরুষকণ্ঠ ব্যস্তভাবে বলতে সুরু করলেন যেসব কথা, আমার বুঝতে বাকী রইলনা ভুল নাম্বারের ব্যাপার।

"একটা বক্স দেখুন, যদি থাকে"—ইত্যাদি।

সজাগ হয়ে বললাম, "এটা রং নাম্বার।"

কণ্ঠে একটু হাসি শোনা গেল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না—ভুল করে দিয়েছে।"

সেই গলা পৃথিবীর বিস্ময় বলে টেলিফোনে মনে হ'ল। কোমল ভেলভেটের ওপর হাত পড়লে যে অনুভূতি হয়, সেই কণ্ঠ শ্রবণে যেন ঠিক সেইরকম অনুভূতি পেলাম। হয়তো সাহিত্যিক ধর্ম অনুসারে বাড়িয়ে বলছি। কিন্তু সে গলা আরও শুনতে ইচ্ছা করে।

তবে, আমি তৎক্ষণাৎ টেলিফোন ছাড়ি-নি এইজন্য যে, স্বর আমার

অত্যন্ত পরিচিত বলে বোধ হচ্ছিল। মনে হ'ল, এ স্বর বহুবার শুনেছি, কোন পরম নিকটজনের কণ্ঠ। ইনি পরিহাস করে পরিচয় দিচ্ছেন না। ভুল হ'তেই পারেনা। ইনি চেনা লোক আমার। কণ্ঠস্বরও ইতস্তত করতে লাগলেন। তিনিও ছেড়ে দিলেন না। অবশেষে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কে?" স্থিরনিশ্চিত ছিলাম কোন পরিচিত নাম শুনব এবার উচ্চহাসির সঙ্গে।

সেই কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে উত্তর দিলেন,—"আমার নাম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।"

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তখন পর্যন্ত মঞ্চে ও পর্দায় অদ্বিতীয় নায়ক বলে খ্যাত। কিন্তু, অন্যদিকেও তাঁর কুখ্যাতি বিস্তৃত। আমার শিক্ষার গোড়াপত্তন ব্রাহ্ম স্কুলে। আমি রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারের অনূঢ়া কন্যা। সাহিত্যিক-খ্যাতি তখনও পাইনি। দুটো চারটে লেখা মাত্র এখানে ওখানে প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে; আমার সাহস নেই। সুতরাং বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম আবিষ্কারের গুরুত্বে।

অথচ দুর্গাদাস আমার প্রিয় অভিনেতা। অতি শৈশবে এক-ঘোড়ার ভাড়া গাড়ীতে মা-বাবার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে যেতাম; তখন দেখেছি অতি সুন্দর তরুণ অভিনেতাকে। 'অযোধ্যার বেগম' নাটকে এক দৃশ্যে দুর্গাদাস লাফিয়ে ষ্টেজে পড়েছিলেন গুপ্ত রন্ধ্রপথে। নাটকের আর কিছুই মনে নেই, কিছুই বুঝতে পারিনি। শুধু ওইটুকু স্মৃতি অক্ষয় করে রেখেছে।

দেখেছি চন্দ্রশেখরে প্রতাপরূপী দুর্গাদাসকে। বোধহয় অমন প্রতাপ নাট্য-ইতিহাসে আর হয়নি।

দেখেছি নির্বাক গোবিন্দলাল দুর্গাদাসকে—ওসমানকে দেখেছি। তখন লাগেজের মত গুরুজনের সঙ্গে যেতে পেতাম। সৌন্দর্যপিপাসু

শিশুর মনে অপরূপ সৌন্দর্যময় পুরুষ ছিলেন দুর্গাদাস। শুধু আকৃতি বা অভিনয় নয়—অমন ছন্দোবদ্ধ চলাফেরা, অমন রাজকীয় মর্যাদা রূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁকে এক অপরিসীম আভিজাত্য ও সম্মান দিয়েছিল।

বর্ণলাঞ্ছিত মুখে, বাজার বেশে তাঁকে দেখেছি দূর থেকে। শুনেছি চরিত্রে তিনি অসংযত। স্কুলে যখন পড়ি, তখন স্কুলেব একটি মেয়ের বাড়ী যেতেন তিনি দাদাব বন্ধু হিসাবে। এক আধটু নাচের ভঙ্গি তিনি তাঁব মেয়েব বযসী কন্যকাকে শিখিয়েছিলেন। সেটাও কেউ ভাল চোখে দেখেনি।

ভিক্টোরিয়া-যুগেব শিক্ষায় মানুষ আমি কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। টেলিফোনে একটু আলাপ না কবে ছাড়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কোন ছবিই ওঁর বাদ যায় নি। তাই কণ্ঠ পরিচিত, অতবার শ্রুত বলে আমাব মনে হযেছিল। উনি আমাব কাছে নিষিদ্ধ ফল, জানি। উনি আমাব জগতেব লোক নন। কি সূত্রে ওঁব সঙ্গে আমাকে এক কববে? রূপকথার বাজপুত্রেব দুর্গাদাস। সামান্য—সাধাবণ প্রতিদিনকাব আমাকে কেন লক্ষ্য কববেন উনি? তবু, একবাব কি বলব না কত মুগ্ধ আমরা ওঁর অভিনয়ে, ওঁর ব্যক্তি-মর্যাদায? বলতে লজ্জা বোধ হ'বে। পর্দানশীন নাবী বোরখায মুখ আবৃত কবেন লজ্জায। আমিও আমাব সত্তা বিলুপ্ত কবে ছদ্মবেশেব বোবখা ধারণ কবলাম।

বললাম, "আমি এ বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে। আপনার অভিনয় আমার বড় ভাল লাগে।"

আমাব স্বর টেলিফোনে শিশুসুলভ শোনা যেত। দুর্গাদাস সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলেন।

তারপর কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে আমার কথাবার্তা চলল টেলিফোনে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় ছোট কাঁচের ঘরের সেই টেলিফোন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল সেদিন। সে কথা সাহিত্যিক বা শিল্পীর বর্ণ-বিচিত্র জীবনের কোন স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা মাত্র। সাধারণ মাপ-কাঠিতে অসাধারণের বিচার চলে না।

দুর্গাদাস বললেন, "মা, তুমি আমার বাড়ী আসবে?"

আমি শিশুসুলভ বিস্ময়ে বললাম, "বা, যাব না কেন? আপনি এলে আমিও যাব।"

"তুমি আমার বাড়ীতে থাকবে, মা?"

"কি করে?"

"আমার ছেলের সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে দি?......তোমাকে কত যত্ন করব, কত বেড়াতে নিয়ে যাব...কত গয়না কাপড় দেব। আমার কত রোজগার, জানো তুমি?" সুলভ উচ্ছ্বাসে দুর্গাদাস নিজের আয়ের অঙ্ক বলে দিলেন। অনেক বর্ণনা দিলেন তাঁর পুত্রবধূরূপে আমার ভবিষ্যৎ সুখ ও ঐশ্বর্যের। ছোট মেয়েকে খেলনা দিয়ে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা যেন।

বললাম, "আপনার বাড়ী গেলে কি টাকার জন্য যাব? শুধু আপনার জন্যই যাব। আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে—আপনার অভিনয়। আমি, আপনি থাকলেই তা"—

বাধা দিয়ে বিতৃষ্ণার সঙ্গে দুর্গাদাস বললেন, "থাক। তুমিও কি ওইসব কথাগুলো বলবে? সব মেয়েই তো আমাকে এ কথাই বলে। তোমার মুখ থেকে এরকম কথা আমি শুনতে চাই না।"

আমি চুপ করে গেলাম। আমার মনের অকৃত্রিম গুণানুরাগ তাঁকে আর জানানো হয়নি। মনে ভার হয়ে আছে।

তারপর সেই অপূর্ব স্বর আদরের কোমলতায় অনেক কথাই

বললেন। ভেলভেটে যেন স্যাটিনের আস্তরণ জড়ানো হল। অপরিচিতা কন্যার প্রতি স্নেহময় পিতার স্নেহপ্রকাশ।

বোঝা গেল তিনি স্থির মস্তিষ্কে নেই। আবেগধর্মী শিল্পীর মন— সহানুভূতিশীল অভিনেতার মন সন্ধ্যার বিলাস-বিরামে একটি ছোট মেয়েকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়ে চিত্ত-প্রাবল্যে ভেঙে পড়ছে। অস্থির মস্তিষ্কের প্রলাপ সেদিন শুনলাম—কন্যাস্নেহেরই আতিশয্য। পরের দিন সকাল দশটায় তিনি টেলিফোন করতে বলে নিরস্ত হ'লেন।

আমি সেদিন অতিশয় উত্তেজিত হয়েছিলাম। যা উপন্যাস বা গল্পে পড়ি, সেটাই ভুল টেলিফোনের দৌত্য করে দিল। 'মা' এই ডাকটির সাবিকাঠি হাতে দুর্গাদাস আমার মনের ভীরু রক্ষণশীলতা, ভিক্টোরীয় কম্‌প্লেক্স, আমার বাড়ীর প্রাচীনপন্থী আবহাওয়া— সমস্ত কিছু উড়িয়ে দিয়েছেন। এমন মানুষ কই দেখিনি তো কোথায়? এঁর ব্যক্তিত্ব নিজের পথ নিজেই করে নেয়। এঁর সহজতা, প্রাণপ্রাবল্যের কাছে অপরিচয়ের বাধা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ইনি অসামান্য, ইনি অসাধারণ।

আজ যাঁর কথা লিখতে বসেছি, সর্বদা স্মরণ রাখতে হ'বে তিনি তো সাধারণ নন। তিনি শুধু অভিনেতা ছিলেন না। তিনি ছিলেন শিল্পী মনে প্রাণে। তাঁর কথা লিখতে বসলে ভাষায় আপনি রং লাগতে চায়।

যিনি জীবনের একদিকে অত সুন্দর, অন্যদিকে কেন তিনি বহুক্ষেত্রে বিচ্যুত?

দুর্বল মন আপনি যুক্তি গঠন করে, আপনি বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করে। জগতের ইতিহাসে আজও একটি প্রকাণ্ড প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। প্রতিভার সঙ্গে নৈতিক চরিত্রের যোগ না থাকলে

কি ক্ষতি হয়? নৈতিক চরিত্র মানে কি? দেশের সুবোধ নির্গুণ বালক, যারা কখনও মদ্যপান করেনি, পরস্ত্রীর প্রতি তাকায়নি, তারাই কি নীতিজ্ঞ! কোন বিশেষ দিকে যদি কদাচিৎ কারুর স্খলন হয়, তা'হলেই কি গুণবাহুল্য সত্ত্বেও সে অপাংক্তেয় হয়ে যাবে?

অবশ্য যাঁকে নিয়ে আলোচনা, তাঁর চরিত্রের কোন গোপনীয় কক্ষের সংবাদ আমি পাইনি। তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে অনুসন্ধিৎসা আমার ছিল না। প্রয়োজন ঘটেনি। তাঁর জগৎ ও আমার জগৎ যে সম্পূর্ণ পৃথক। এখনও প্রয়োজন হ'ল না তাঁর সামাজিক ব্যবহার ও শিল্পী-জীবন ভিন্ন অন্য কোন জীবন বা অন্য কোন ব্যবহারের সন্ধান রাখা। তিনি যে আমাকে মা বলে ডেকে একমুহূর্তে বিশেষ সম্মান দিলেন। আমাকে এমন স্থানে আপন করে নিলেন, যেখানে ও-সব প্রশ্ন ওঠে না।

তবু বারে বারে অতৃপ্ত মন মানুষের ধী-শক্তির কাছে প্রশ্ন পাঠায়: যাঁরা আমাদের আনন্দ দেন, প্রতিদিনের জীবন থেকে তাঁদের কি চিরদিনই আমরা সরিয়ে রাখব?

দুর্গাদাসকে সামান্য যে-টুকু দেখেছিলাম, তা'তে তাঁর চরিত্রের যে বিশিষ্ট দিক আমার দৃষ্টির সম্মুখে ঈষৎ উন্মোচিত হয়েছিল, সে কথাই বলব। সেই সঙ্গে হয়তো আরও অনেক শিল্পীর আপাত-দৃষ্টিতে অবোধ্য জীবনের রহস্যগ্রন্থিও কিছুটা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। আমরা কতটা চিনতে পেরেছি তাঁদের? কতটা তাঁরা সামাজিক পরিমণ্ডলে উপযুক্ত স্থান পেয়েছেন? কতখানি সৌহার্দ্য পেয়েছেন? কতবার তাঁরা ঠিকানা ভুল করেছেন দুর্গাদাসের মতই?

পরের দিন যথাসময়ে টেলিফোন করলাম মনে অনেক আশা নিয়ে। ধরলেন যিনি, তাঁর কণ্ঠ ভুল করবার নয়।

"আপনি কাল রাত্রে আমাকে বলেছিলেন আজ সকালে টেলিফোন করতে—তাই—"

কথা শেষ হ'বার পূর্বেই টেলিফোন চলে গেল অন্য হাতে। দুর্গাদাস তাঁর সহধর্ম্মিণীর হাতে রিসিভার তুলে দিয়ে চাপাকণ্ঠে শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্দেশ দিতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি স্পষ্ট ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম ও চাপা সুরের কথাগুলো কিছু কিছু শুনতে পেলাম।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "উনি তো এখানে নেই এখন।"

আমি স্পষ্ট সেই অবিস্মরণীয় কণ্ঠ শুনেছি কিন্তু। জিদ চেপে গেল। নইলে যে কোন মেয়েই এতটা অপমানের পর তখনি টেলিফোন ছেড়ে দিত।

আমার মন অপ্‌টিমিষ্ট্‌—মানুষকে ভাল ভেবে ধরে নেওয়া এ জাতীয় মনের ধর্ম। মানুষকে খারাপ হ'তে দেখলেও মনে হয়, নিশ্চয় কোথাও একটা ভুল হয়েছে। সত্যই মানুষ কি এত পরিবর্তিত হ'তে পারে?

তাছাড়া বিগত রজনীব স্মৃতি এখনও মনে উজ্জ্বল। সেই লোক কয়েকঘণ্টার ব্যবধানে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চান নাকি!

বুঝলাম, অস্থির মস্তিষ্কে ও অসতর্কক্ষণে দুর্গাদাস অনেকবার এমনি ভুল নাম্বারে পৌঁচেছেন। সেই ভুল সাংসারিক জীবনে তিনি মুছে ফেলতে চান।

শেষ পর্যন্ত দেখবার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করলাম, "উনি কোথায়?"

দুর্গাদাস পত্নীকে চাপা গলায় এমন একটি স্থানের নাম করতে বললেন, যেখান থেকে ডেকে আনবার কথা কোন ভদ্র মহিলা বলতে পারেন না।

দুর্গাদাস-পত্নী স্বামীর উক্তি যথাযথ বলে দিলেন। এখন পর্যন্ত ভীরু দ্বিধা ছিল মনে। কথাটির আঘাতে সুপ্ত আত্মসম্মান জাগ্রত হয়ে উঠল।

রুক্ষ ও দৃঢ়স্বরে বললাম, "আমার তাঁকে দিয়ে কোন প্রয়োজন নেই। আমি প্রার্থী হয়ে বা কোন উদ্দেশ্যে তাঁকে বিরক্ত করছি না। তাঁকে বলে দেবেন, তিনিই আমাকে টেলিফোন করতে বলেছিলেন।"

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বামীকে বললেন, "বলছে, তুমিই টেলিফোন করতে বলেছিলে।"

"আমি!" বিমূঢ় কণ্ঠ শোনা গেল। পরমুহূর্তেই আমি "আচ্ছা," বলে টেলিফোন ছাড়বার আগেই দুর্গাদাস টেলিফোনে এলেন।

"আমি আপনাকে টেলিফোন করতে বলেছি?"

"হ্যাঁ। কালরাত্রে অনেকবার বলেছেন।"

"কই, স্মরণ হচ্ছে না তো!"

'শরণ' ও 'স্মরণ' কথা দুইটির উচ্চারণের পার্থক্য এমন কারুর মুখে শুনিনি। বাংলা বাক্য উচ্চারণের বিশুদ্ধতা দুর্গাদাস সেইদিন আমাকে শিক্ষা দিলেন অজ্ঞাতসারে।

"কেন, আপনি যে কাল রাত্রে আমার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়ে দিতে চাইলেন?"

"ও! তুমি সেই খুকি? বুঝেছি এতক্ষণে।" উচ্চ হাসির সঙ্গে শোনা গেল।

"আমি খুকী নই।"

"না, না! তুমি কেন খুকী হবে? খুকী বললে আজকালকার মেয়েদের ভাল লাগেনা, আমি তা জানি। তা, মা, রাগ করেছ?"

আমার রাগের অবকাশ কোথায়? নিজের বয়সও জানাতে পারলাম না। অতি ছোট মেয়ের মতই তিনি আমাকে আবার

গ্রহণ করলেন। বুঝলাম তাঁরও ভীতি আছে। ভুল নাম্বার তিনি এড়াতে চান। এতবার এত ভুল ঠিকানায় পৌঁছেছেন তিনি, যে তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে নিঃসন্দেহে।

মাঝে মাঝে টেলিফোনে কথা চলতে লাগল। শিল্পী হিসাবে যাঁকে ভাল লেগেছিল, মানুষ হিসাবে তাঁকে অসাধারণ দেখলাম।

একদিন দ্বিপ্রহর প্রায় বা'রাটায় আমি টেলিফোনে বললাম "আপনি টেলিফোন করতে বলেন। কিন্তু, একদিনও আপনি আমাদের বাড়ী এলেন না। বাড়ীর কেউ আপনাকে দেখলেন না। আমি রোজ রোজ কি-করে টেলিফোন করি?"

এখনও স্পষ্ট কানের কাছে দুর্গাদাসের গভীর মধুর কণ্ঠ ও অপরূপ বাচনভঙ্গি শুনতে পাই যেন—"তুমি ঠিকই বলেছ, মা। আমারি ভুল হয়েছে। আমি এক্ষুনি— এক্ষুনি যাচ্ছি। পনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছব। এই —গাড়ী—"

সত্যই পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রকাণ্ড কাল গাড়ী এসে থামল দরজায়। গাড়ীর দ্বার খুলে তরুণ যুবকের মত লাফিয়ে নেমে এলেন যিনি, মুকুটহীন রাজা বললেই তাঁর মানানসই বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যায়।

এগিয়ে গেলাম অভ্যর্থনায়। দুর্গাদাস ব্যস্ত দৃষ্টি আমার চারপাশে পাঠিয়ে বলে উঠলেন, "আচ্ছা, এই বাড়ীতে বাণী বলে যে একটি ছোট মেয়ে থাকে, আমি তার কাছে এসেছি।"

ঘরে তাঁকে বসিয়ে পরিচয় দিলাম, "আমিই সেই মেয়ে।"

অতিশয় বিস্মিত হ'লেন তিনি। আমার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে মাথা নামিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

বললাম, "আপনার ভুল হয়েছিল। আমি শিশু নই।"

দুর্গাদাস ততক্ষণ আত্মসংবরণ করে নিয়ে আমার বিষয়ে নানা প্রশ্ন করছেন।

আমি লিখি শুনে তিনি খুসী হ'লেন। তখন পর্যন্ত আমার একটি বইও প্রকাশিত হয়নি।

সাহিত্যিক কয়েকটি প্রশ্ন তিনি হঠাৎ পরীক্ষকের মত আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। একটি মনে আছে "শেক্‌সপীয়র'ও কালিদাসের মধ্যে তফাৎ কি?"

আই-এ ক্লাশ থেকে উত্তর তৈরী ছিল। উত্তর শুনে তিনি প্রীত হ'লেন। দেখলাম তাঁর মনে সাহিত্য-বোধ আছে, তাঁর মনে সাহিত্যিক ভাব আছে। তিনি কিয়ৎ পরিমাণে পড়াশোনা করেছেন সাহিত্য। সাহিত্য তিনি ভালবাসেন।

দুর্গাদাস আমাকে 'আপনি' বলে দূরত্ব রেখে কথা বলতে লাগলেন। কাছের মানুষ আবার হারিয়ে গেল।

তিনি একজন নবীনা তরুণীর সঙ্গে রসিকব্যক্তিজনিত ব্যবহার করতে উদ্যোগী হলেন। কথায় হালকা সুর লাগল, বন্ধুত্বের অঙ্গীকাবে তিনি পানি পেতে দিলেন।

আমি বুঝলাম, তিনি নিশ্চিত ধরে নিয়েছেন যে আমার ছলনার আত্মগোপনটা কোন কোন নারীর তাঁর কাছে চিরাচরিত চাহিদার পূর্বাভাষ মাত্র।

বললাম,—"আপনি তো বোঝেন সব। আপনি আমাকে মা বলে ডেকেছেন বলেই আমি এত সহজে আপনার সঙ্গে মিশতে পারছি। নইলে, কি সম্ভব হ'ত?"

দুর্গাদাস আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পরমুহূর্তে আমার পরিচিত ব্যক্তিকে ফিরে পেলাম, "ঠিক! তুমি ঠিক বলেছ, মা!"

আমার ভিক্টোরীয় মন আশ্বাস পেল। তারপরে তিনি আমার সঙ্গে কত কথা বললেন! কত কথা!

বললেন, "আমাদের কি পরিচয়, বল? কি ঘৃণিত জীবন! নট!

নট !" বিতৃষ্ণায় তাঁর আকুঞ্চিত মুখ আমি যে আজও দেখতে পাই। "যাই করিনা কেন, লোকে বলবে নট। আমি একজন নট মাত্র। মুখে রং মেখে নটগিরি আমার পেশা।"

সমগ্র ঘর পূর্ণ করে আহত আত্মার বিক্ষোভ বেজে উঠল। জানিনা, প্রতিদিনের, প্রতিমুহূর্তের দুর্গাদাস কেমন। তাঁর অগণিত বন্ধু, হয়তো তাঁর অন্যরূপ জানেন। কিন্তু আমার দেখাটাই যে ভুল, সে কথাই বা বলে কে ?

সেদিন দেখেছিলাম নিজের ওপর তাঁর চরম বিতৃষ্ণা, নিজের জীবনযাত্রার উপর অনাস্থা। উচ্চ জমিদার বংশের সন্তান দুর্গাদাস আর্টস্কুলের ছাত্র ছিলেন। অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য-পিপাসা ও রসবোধ, অসামান্য দৈহিক সৌন্দর্য, অভিনয়প্রতিভা একত্রিত হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁকে নাট্যমঞ্চে টেনে আনে যৌবনের প্রারম্ভে। যে সময়ের কথা আমি লিখছি, তখন আনুমানিক বয়স ছিল দুর্গাদাসের পঞ্চান্ন।

যে পেশা তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, যে পেশা এখনও তাঁর স্বেচ্ছা-রক্ষিত, সেই পেশার উপর অকৃত্রিম ও অপরিসীম ঘৃণা দেখেছিলাম তাঁর আমি। বেলা তখন দ্বিপ্রহর, দুর্গাদাস সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ ছিলেন। আমার জীবনে এ জাতীয় ঘটনা প্রাত্যহিক নয়। আমারও যথার্থ ভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কথা মনে আছে।

তাই ভাবি, আজ যাঁরা সিনেমায় আত্মবিসর্জন করতে ব্যগ্র প্রাংশুলভ্য ফলের মোহে; আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ সিনেমায় জ্বলছে বিবেচনা করে যে সমস্ত অপরিণতবয়স্কা তরুণ-তরুণী সিনেমার দ্বারে ঘুরে মরেন; তাঁদের কাছে দুর্গাদাসের শেষ জীবনের এই কথা কয়েকটির কি কোন গুরুত্ব নেই ? চিত্র ও মঞ্চে একত্রে সফলতম, অতি সুপুরুষ অভিনেতা দুর্গাদাস, কলিকাতা নগরীর মানসকুমার দুর্গাদাস, তাঁর মুখে এমন কথা কেন ? কেন তাঁর এত ঘৃণা ?

সৌন্দর্যের স্বপ্ন মনে নিয়ে শিল্পী যাত্রা আরম্ভ করে। কিন্তু, সৌন্দর্যের সাধনা-পথে সে স্বপ্ন যদি হারিয়ে যায়, তা'হলে শিল্পীর জীবন বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে।

সেই দিন, সেই মুহূর্ত থেকে সিনেমা বা মঞ্চের জগতে সুখ আছে বলে আমার বিশ্বাস নেই।

বাড়ীতে পুরুষ ছিলেন না। মা এলেন। জলযোগের আয়োজন এল। আমার অবান্তর কথা ভাল মনে নেই। মা আসা মাত্র দুর্গাদাস বললেন, "মেয়ে নিতে পারি। আমার বড়ছেলের সঙ্গে। আমার পছন্দ হয়েছে।"

আমরা অভিনেতাকে লঘুচিত্ত বলি। কিন্তু সেদিন সেই অভিনেতাকে দেখেছিলাম, যিনি আমার অভিনয়কে সত্য বলে ধরে নিয়ে সরল সহজভাবে ব্যবস্থা করছিলেন। যে কথা খেলাচ্ছলে হয়ে গেছে, তার ব্যতিক্রম তাঁর কাছে নেই। তখন আমার বয়স কম ছিল, মন কৌতুকপ্রবণ ছিল স্বাভাবিকতঃ। তাই আজ নিজেকে ক্ষমা করতে পারি।

মা বিব্রত হয়ে উঠলেন। আমার বিবাহ-বিতৃষ্ণা বিদিত। মা তাড়াতাড়ি বললেন, "সে তো ভাল কথা। তবে, আমরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আপনারা রাঢ়ীশ্রেণী। দেশে বুড়ো শ্বশুর আছেন"—

দুর্গাদাসের প্রসন্ন সুন্দর মুখের উপর মেঘের ছায়া পড়ল। আমি বললাম, "গোঁড়া সেকেলে জমিদারের ঘর কিনা"—

দুর্গাদাস সগর্বে আমার দিকে তাকালেন অভিমানী শিশুর দৃষ্টিতে, "আমিও জমিদারের ঘর, বুঝলে? আমিও জমিদার।"

মা বললেন, "আমি আমার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করব না হয়। উনি তো এখন বাড়ী নেই।"

দুর্গাদাস বললেন, "বেশতো। আপনি শ্বশুরবাড়ীর মত নিন।

তারপরে, আপনার স্বামীকে বলবেন, আমাকে একটু আপনাদের মত জানিয়ে দিতে।"

বিবাহের প্রশ্ন ওঠেনা এখানে। তবু আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার ছেলে কি আপনার মত সুন্দর দেখতে?"

অতি আন্তরিকতায় উত্তর এল, "না মা, বড়টি আমার মত নয়। তবে হ্যাঁ, মেজ আমার মত দেখতে। তবে, তার বয়স যে তোমার সঙ্গে কুলোবে না, মা।"

এতবড় মেয়ে নিজের বিবাহ সম্পর্কে ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে এমন নির্লজ্জ আলোচনা করছে, এতে তিনি একটুও বিস্মিত হলেন না। এই প্রথম শ্রেণীর শিল্পী মন।

তাঁর ভদ্রতা, সৌজন্য, সহৃদয়তা, উদারতা ও আশ্চর্য সারল্য আমাকে মুগ্ধ করল। তিনি আমাকে তাঁর নিকট আত্মীয়া রূপে গ্রহণ করতে চেয়ে আমাকে সম্মান দিয়ে ধন্য করলেন। প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ব্যবহারে এমন আভিজাত্যের প্রকাশ কোথাও দেখিনি আর। যেন নিজের ছন্দোভ্রষ্ট জীবনে প্রাণপণে এই শালীনতা, এই আভিজাত্য আঁকড়ে থাকা তাঁর ইষ্ট কবচ।

দুর্গাদাস একটি এলাচ মাত্র তুলে নিলেন। আমি দুঃখিত হয়েছি দেখে কোমল কণ্ঠে বললেন, "আমার শরীর খারাপ। যখন তখন খাওয়া সহ্য হয় না। আমার জলখাবারের পাট নেই। তুমি বরঞ্চ একদিন রাত্রে আমাকে খাইও, কেমন? বেশী নয়, শুধু রুটী দু'খানা আর একটু মাংস। তোমার মা তো শুধু মা নন, বিদূষী সাহিত্যিকা। ওঁর হাতের রান্না আমি খেয়ে যাব। একটু মাংস আর দু'খানা রুটী। তোমার কবিতা আমাকে একদিন শোনাবে তো?"

সে কবিতাও শোনানো হয়নি। সে রুটি-মাংসও খাওয়ানো হয়নি। চলে গেলেন ঘর থেকে। আমি এগিয়ে দিতে এলাম। শীতকাল।

কমলালেবু-ওয়ালা প্রকাণ্ড ঝাঁকা মাথায় কমলালেবু নিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুর্গাদাস বলে উঠলেন, "শুধু হাতে এসেছি। কিছু খাবার দিয়ে যাই।" সমস্ত লেবু কিনে তিনি আমাকে দিয়ে গেলেন। বাধা মানলেন না।

গাড়ীতে বসে একটু হেসে বল্লেন, "কপালের টিপটা যে বেঁকে রয়েছে, মা। সোজা করে বসাও। তোমার সংসারে মন লাগবে তো? বিবাহিত জীবন সম্পর্কে তোমার মতামত কি? আধুনিক মেয়ে তো তুমি! তোমরা মা হ'তে চাওনা।"

স্নেহময় পিতা আবার নিকটতম বন্ধু হয়ে গেলেন। এক লোকের মধ্যে এতই বিভিন্ন দিক! তীক্ষ্ণ তাঁর দৃষ্টি এত!

তখন 'রংমহলে' দুর্গাদাস ছিলেন। মোপাঁসার 'Useless Beauty' এর ভাব নিয়ে লেখা নাটকের সমস্যা তাঁর মনে ফিরছে বুঝতে পারলাম। তাঁর মন গভীরতাধর্ম্মী, তা-ও বোঝা গেল।

গাড়ী ছাড়বার আগে দাঁড়িয়ে তিনি হাত তুললেন—কালচে সাহেবী পোষাক—শুভ্র মুক্তার মত গাত্রবর্ণ। চোখের নীচে কিন্তু শ্রান্তির রেখা, ম্লান অনবদ্য রূপ। দুরারোগ্য ব্যাধি তখনি তাঁর উপর মৃত্যুর অধিকার বিস্তৃত করে দিয়েছে। পঞ্চান্ন বৎসরের প্রৌঢ়—অত্যাচারে ভগ্নস্বাস্থ্য। মৃত্যুর ছায়া পড়েছে সর্ব্বাঙ্গে। কিন্তু, একহারা—সোজা, কালো পোষাকধারীর ভঙ্গীতে রাজকীয় আভিজাত্য, রোমান্টিক নায়কের প্রকাশ। হাত তুলে তিনি বললেন, "যখনি তোমার দরকার হ'বে, তুমি আমাকে ডেকো। আমি যেখানেই থাকি, আসব।"

আমার জীবনে সেই আশ্চর্য সুন্দর পুরুষ আর ফিরে আসেন-নি। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি এখনও অক্ষয় হয়ে আছে।

অনেকদিন পরে। ১৯৫৩ সালে নয়ই আগষ্ট রংমহলে 'আদর্শ হিন্দু

হোটেলে'র রজত-জয়ন্তীতে নিমন্ত্রিত ছিলাম। সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র 'রূপাঞ্জলির' সহকারী সম্পাদক সরোজ চক্রবর্ত্তী আমাকে বসাতে নিয়ে গেলেন অন্যান্য সাহিত্যিকের সঙ্গে। তখনও দেরী ছিল অভিনয়ের।

ধীরাজ ভট্টাচার্য্যের ঘরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস মহাশয় অপেক্ষা করছিলেন। ঘরের মধ্যে একখানি চেয়ারে বসানো হ'ল আমাকে।

চোখ তুলেই দেখলাম সম্মুখের প্রাচীর-গাত্রে একেবারে আমার মুখোমুখি দুর্গাদাসের একখানি আবক্ষ জীবন্ত চিত্র। সহাস্য চিত্র।

ধীরাজবাবু বললেন, "এই ঘরটি দুর্গাদাসবাবুর সাজঘর ছিল। শেষদিন পর্য্যন্ত উনি এই ঘরই ব্যবহার করতেন।"

অভিনেতার সাজগৃহে জীবনে প্রথম পদার্পণ আমার। ড্রেসিংটেবলে রংএর সরঞ্জাম। কতবার কত নটের বেদনা-বিকৃত মুখ ওই প্রলেপে আবৃত করতে হয়েছে। কতবার কতজনের আহত ভিখারীহৃদয় রাজপোষাকের তলায় চাপা দেওয়া হয়েছে। চোখের তুলিকৃত কালিমা ধুয়ে দিতে কি কোন চোখে অশ্রু নামেনি, চোখ জ্বালা করে নি? পাদপ্রদীপের আলোয় কত অভিনেতা কতদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন?

'শাপমোচনের' সেই অভিশপ্ত গন্ধর্ব্ব অনেকদিন আগে আমার মত সামান্যের কাছে এসেছিলেন। ছন্দঃপতনের অপরাধে সুরসভার অভিশাপে গন্ধর্ব্ব সৌরসেনের দেহশ্রী হ'ল বিকৃত। তিনি অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গভ্রষ্ট হ'লেন।

মর্ত্ত্যের কুশ্রীতায় তাঁর আবৃত রূপ। স্বর্গের করুণা কি তাঁর শাপমোচন করতে নেমে আসেনি? করুণায় কি অভিশপ্তের জীবনে অবশেষে সুন্দরের আবির্ভাব হয়েছিল?

"আমি এলেম তোমার দ্বারে,
ডাক দিলেম অন্ধকারে।"

দেখেছিলাম শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব্বকে আমি। দেখেছিলাম তাঁর অন্তরের সুন্দরকে। অভিশপ্ত, স্বর্গভ্রষ্টের বেদনা কত তীব্র, আমি অনুভব করেছিলাম। কারণ, আমার মনে দুর্লভক্ষণে স্বর্গের করুণা জন্ম দিয়েছিল শ্রদ্ধার, মুগ্ধতার। গুণানুরাগে শুধু তাঁকে কাছে পেয়েছিলাম সেই শ্রদ্ধার দ্বারাই। হয়তো চিনেছিলাম তাঁকে।

দুর্গাদাস ঠিক নাম্বারই পেয়েছিলেন।

কীর্তিনাশার কূলে

সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে শুনলাম।

কলিকাতার বেতার কেন্দ্র। সাহিত্য বাসরের আসর। তখন সকাল বেলায় অনুষ্ঠিত হ'ত দীর্ঘতর অনুষ্ঠান।

আমি তখন 'পুনরাবৃত্তি' প্রকাশের কিঞ্চিৎ খ্যাতি অর্জন করেছিলাম। আমার রচিত ছোটগল্প 'পঞ্চকন্যা' সেদিন পঠিতব্য ছিল।

বিখ্যাত ব্যক্তিটি পাঠ করলেন অবনীন্দ্রনাথের 'রাজ কাহিনীর' বাপ্পাদিত্য।

নির্দিষ্ট সময়ে লাল টেবিলের দুধারে দুজনে বসেছি একেবারে মুখোমুখি। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি। ধুতি পাঞ্জাবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়েছে স্থূল দেহের। বর্ণ কৃষ্ণাভ। মুখ চোখে ঈষৎ উগ্র ভাবব্যঞ্জনা।

প্রথমে তিনি পাঠ করলেন আবৃত্তির ছন্দে অবনীন্দ্রনাথের অমর সৃষ্টি —প্রায় কবিতায় লেখা শোলাঙ্কিকুমারী ও বাপ্পারাওয়ের প্রেম-কাহিনী। মধুর ভাষার আবৃত্তি হ'ল মধুরতর। আমার কান জুড়িয়ে গেল।

ভদ্র ব্যক্তিটির সম্পর্কে বহুদিন ধরেই নানা তথ্যে অবহিত ছিলাম। তাঁর রচনা পাঠ করেছিলাম। তাঁর সম্পর্কে নানা বিষয় শুনে শুনে ধারণা একটা হয়েছিল যে, তিনি খুবই ভাল আবৃত্তি করেন। আজ প্রমাণিত হয়ে গেল। মন অভিভূত হয়ে যায় ওঁর আবৃত্তি শুনতে পেলে।

একটু আগে রেডিওর অপেক্ষাগৃহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির লক্ষ্য হয়েছিলাম। গ্রাহ্য না করা লক্ষ্যের দৃষ্টি। এখন তিনি নিজের পাঠ্যবস্তু নিয়ে ব্যস্ত। সম্মুখের দিকে তাকাবার অবকাশ নেই।

তিনি আমাকে চোখে না দেখলেও চিনতেন। কিছুদিন পূর্বে 'শনিবারের চিঠিতে' আমার 'প্রেম' উপন্যাসখানি ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'তে হ'তে সহসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্পাদক শ্রীসজনীকান্ত দাশ মহাশয় নজির দেখিয়েছিলেন যে, যুদ্ধের বাজারে পেপার কন্ট্রোল এর কারণ। প্রমাণার্থ তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর 'পিশাচ' উপন্যাস ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পিতাপুত্র' (দুই পুরুষ) নাটক সমভাবে মধ্যপথে বিরতি লাভ করেছে। সেটা বাংলা ১৩৪৯ সাল।

পরে, বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছিলাম উপরোক্ত ভদ্র ব্যক্তিটিই আমার 'প্রেম' উপন্যাসখানি বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সম্পাদককে। সম্পাদক মহাশয় নির্দেশ পালন করেছিলেন। অবশেষে আমার কাছেও সম্পাদক স্বীকারোক্তি করলেন একদিন। কারণ ভদ্র ব্যক্তিটি নিজেই বিভিন্ন স্তরে বলে দেন—"আমিই বাণী রায়ের বইখানা সজনীকে বলে বন্ধ করাই। কি যে একটা বই লিখেছে !"

'প্রেম' আমার কলেজ জীবনে রচিত। কোন বই কারুর ভাল না লাগলে কিছু বলবার নেই। তবে আমার সেদিন মনে হয়েছিল, ভদ্র ব্যক্তিটি বিরাট সমালোচক ও সাহিত্যিক সত্য। কিন্তু, মাত্র এক সংখ্যা রচনা পড়ে কেন মত দিলেন ? দিলেন কি করে ?

এই ছলে আমি নিজের বিজ্ঞাপন দিতে বসিনি। কেন একথা লিখলাম একটু পরেই বোঝা যাবে।

সেদিন দেখলাম কথকের নিষ্ঠা। চট্ করে একটি দুটি বাঁধানো দাঁত

তিনি খুলে নিয়ে প্রস্তুত হ'লেন। একমনে সম্মুখে খোলা 'রাজকাহিনী' তিনি মনে মনে অনুধাবন করে চলেছেন। তাঁর সমগ্র সত্তা সংহত হয়েছে যথাযথ ভাবে অংশটুকু বেতারে প্রচার করার মধ্যে। নির্দিষ্ট সময়ে দরজার মাথায় রক্তিম আলো দেখা দিল। পড়া আরম্ভ হ'ল।

প্রতিটি শব্দ তিনি রস গ্রহণ করে উচ্চারণ করছেন। প্রতিটি পংক্তিতে নিজের কাব্যরসিক মন উজাড় করে দিয়েছেন। ভোক্তা সুখাদ্য যেমন ভাবে লালায়িত রসনায় আস্বাদ করে করে তবে গলাধঃকরণ করে, ঠিক তেমনি ভাবে তিনি যেন সাহিত্য আহার করছেন—শুষ্ক পাঠ মাত্র করে যাচ্ছেন না যন্ত্রের দোদুল্যতার সম্মুখে। তাঁর পড়ার ভঙ্গি মনে পড়ছে এখনও শ্লোকার্ধে—

"আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ!
ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ।"

পাঠান্তে আমার শুষ্ক গদ্য 'পঞ্চকন্যার' কাহিনী সুরু হল—"না, না আমি পুরাণখ্যাতা চিরস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার কাহিনী লেখবার উদ্দেশে কলম ধরি নি"—১৩৫৩ সালে শারদীয়া 'শনিবারের চিঠিতে' গল্পটি প্রকাশিত হয়। সুতরাং তারও পূর্বে বেতারে পঠিত। সে সময়ে ওই রকম মুখবন্ধ সুপ্রাপ্য ছিল না।

ভদ্র ব্যক্তিটি চোখ তুলে তাকালেন। সজাগ হয়ে উঠল চোখ। তক্ষুণি রেডিওর একজন এসে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেলেন। তাঁর শোনা হল না। হয়তো ইচ্ছা ছিল।

আমি আমার অক্ষম রচনা পাঠান্তে বাইরে এসে আর তাঁকে দেখলাম না। বাড়ী ফেরার পথে কানে বাজতে লাগল "আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ।"

উল্লিখিত ভদ্র ব্যক্তিটি স্বনামধন্য মোহিতলাল মজুমদার।

স্বর্গগত মোহিতলাল মজুমদার বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ একজন সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও বোদ্ধা। তিনি ছিলেন রবীন্দ্র পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক। তাঁর রচিত সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর কবিতা ভাবের দিক থেকে নবযুগ এনেছিল নিঃসন্দেহে। তবে তাঁর ভাষা রবীন্দ্র ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে নি। নূতন ভাব প্রাচীন আঙ্গিকে লেখা—মোহিতলালের কাব্য।

স্কুলের সামান্য শিক্ষকতা থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপকপদ লাভ করেছিলেন। লোকমুখে শুনেছি তিনি অধ্যয়নশীল ও মনীষী ছিলেন। যথার্থ সাহিত্য বোধ ছিল। তিনি সাহিত্যে অনুপ্রাণিত জীবন যাপন করেছিলেন।

'শনিবারের চিঠির' সমালোচনার চমৎকারিত্বের জন্য সে যুগে দায়ী ছিলেন প্রধানতঃ মোহিতলাল। 'চিঠির' শৈশব থেকে তিনি জড়িত ছিলেন 'চিঠির সঙ্গে। সত্যসুন্দর দাস ছদ্মনামে, স্বনামে, অনামে ব্যঙ্গ রচনা ও সমালোচনা তাঁর প্রকাশিত হত ওখানেই। কবিতাও ছিল প্রচুর।

অধ্যাপনায় অবসর গ্রহণের পরে মোহিতলাল কিছুদিন 'বাগনানে' বাস করেছিলেন শুনেছি। শেষের কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় ছিলেন। অমনি সারা মহানগরীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধে গেল।

তিনি ছিলেন দুর্মুখ। অল্প আলাপে ভয়ই হ'ত আলাপিতের। তবে সাধনা তাঁর ছিল অকপট। প্রকৃত সাহিত্যানুরাগী এমন ব্যক্তি চোখে পড়ে না। দুর্ধর্ষ সমালোচকের মধ্যে সর্বদা জেগে থাকত একজন কবি। যুগের সামঞ্জস্য হয়নি তাঁর জীবনে। সেটাই ট্রাজেডি।

শেষ জীবনে তিনি অতি রূঢ় ভাষায় বন্ধুজন ও যাবতীয় সাহিত্যিকের নিন্দা করে গেছেন। প্রত্যুত্তরে অনেকে তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। তবে, প্রয়োজন ছিল কি?

আমার প্রথম লেখা 'প্রেম' উপন্যাস তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন সত্য। সম্পূর্ণ পড়ে দেখার প্রবৃত্তি তাঁর হয়নি। লেখাটি আমি 'চিঠিতে' গছিয়ে সেধে দিতে যাইনি। সম্পাদক মহাশয়ের চাওয়াতেই দিয়েছিলাম। আগে আমার কয়েকটি ছোটগল্প মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আমি নবাগত মাত্র। খ্যাতনামা লেখকের রচনার নিন্দা-প্রশংসায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু আমার এই উপন্যাস বিনা কারণে বন্ধ হওয়ায় আমার অবস্থা হয়েছিল গুরুতর। পাঠকের তাগিদে সজনীবাবু 'চিঠির' সম্পাদকীয়তে লেখেন "বৈশাখ হইতে প্রেম চলিবে।" (১৩৪৯ চৈত্র 'শনিবারের চিঠি)।

সে বৈশাখ কোনদিন এল না। মোহিতলালের প্রভাবগ্রস্ত 'শনিবারের চিঠি' তখন। ধারাবাহিক সমালোচনা সম্পদে তিনি 'চিঠির' মান বৃদ্ধি করেছিলেন।

অপাংক্তেয় নবীন লেখকের রচনার দাবী অপাংক্তেয় পাঠক সমাজ করে থাকলেও উপেক্ষা করা চলে। আমি নিজের মান রক্ষার জন্য 'প্রেম' ফেরৎ নিয়ে এলাম।

তারপরে অত্যন্ত অসুবিধায় আমাকে পড়তে হয়েছিল। বন্ধুদের মুখে শুনি, বিভিন্ন প্রকাশকেরা আপত্তি জানান যে, সজনী দাস যে উপন্যাস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছেন, সে উপন্যাস তাঁরা ছাপাতে পারবেন না। সেটা ১৩৫০ সাল—'শনিবারের চিঠি' তখন সাহিত্য ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

নীরবেই ছিলাম। 'পুনরাবৃত্তির' বিক্রয় দেখে 'জেনারেল প্রিন্টার্সের'

শ্রীযুক্ত সুরেশ দাস মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'প্রেম' প্রকাশ করলেন।

আমার প্রথম সাহিত্য জীবনের দারুণ ক্ষতি যিনি না জেনে অতি তাচ্ছিল্যে করেছিলেন, আমি তাঁর বিরুদ্ধে একটিও অসংযত বাক্য উচ্চারণ করিনি। কারণ তাঁর ছিল অসামান্য প্রতিভা। প্রতিভার সঙ্গে রূঢ়তা মিশ্রিত থাকে। অনেক সময় স্বভাবের দৈন্য থাকে। কিন্তু আমাদের উচিত সেগুলি উপেক্ষা করা। আমাদের উচিত প্রতিভাকে সম্মান দেওয়া, যদি সে প্রতিভা কিয়দংশ বিকৃত হয়েও থাকে।

তাই বলি, মোহিতলালের তুচ্ছ ব্যবহারিক ত্রুটী বা অযথা রূঢ় ভাষণে কিছু আসে যায়নি। যাঁরা তাঁকে বিদ্রূপ করে আনন্দ পেয়েছিলেন তাঁরা নিজেকেই অপমান করেছিলেন। একথা বলবার সাহস আমার আছে।

মোহিতলালের সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ বঙ্গবাসী কলেজের সারস্বত সম্মেলনে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিনে। অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে সভাটি বিদ্বজ্জন পরিবৃত হয়। সেবারে সভাপতি ছিলেন মোহিতলাল। দীর্ঘ অনুষ্ঠানের পরে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি লিখিত সুদীর্ঘ ভাষণ পাঠ করলেন। সাধুভাষায় লেখা তাঁর ভাষণ বর্তমানে অতিশয় বেমানান লাগছিল। মাথার উপরে বেলা একটার সূর্য চন্দ্রাতপের ফাঁকে উত্তাপ বিকীরণ করে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে সভা জনশূন্য হ'তে লাগল। মোহিতলালের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বেতার-পাঠ করেছিলেন, সেই নিষ্ঠাই দেখলাম সভাপতির ভাষণে। তাঁর মতে, ভাষা সর্বদা সাধু হওয়া উচিত, ক্রিয়াপদ হওয়া উচিত বিশুদ্ধ, 'করিয়াছি', 'হইয়াছি' ইত্যাদি। ছাত্রদের প্রতি সাহিত্য বিষয়ক উপদেশ ছিল সে ভাষণে। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের কথা, ছিল একটু ব্যক্তিগত ইতিহাস। ব্যক্তিগত

ক্ষোভ ও প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণ ছিল। অনেক দিনের কথা। সামান্য অংশ মনে আছে—'আমি লোক চক্ষুর অগোচরে নীরবে বাস করিতেছি। একদল ব্যক্তির আমার প্রতি অযথা বিদ্বেষের কারণ বুঝিতেছি না।' বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বস্তুর তালিকা থেকে তাঁর একখানি বই বাদ দেওয়ার কথাও ছিল।

সভাপতির ভাষণ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে শ্রীযুক্ত সজনী দাস সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ এসে বসলেন সম্মুখের আসনে। সভার শেষে মোহিতলালের কাছেই তিনি বসেছিলেন। কিন্তু মোহিতলালকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম না।

সভান্তে জগদীশবাবু তাড়াতাড়ি নিজের বসবার ঘরে সভাপতিকে নিয়ে গেলেন। জলযোগের আয়োজন ছিল। মোহিতবাবু তখন সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। মাথায় তিনি ক্রমাগত জল দিচ্ছিলেন ও গভীর স্বরে "আঃ, আঃ" এই আক্ষেপোক্তি করে যাচ্ছিলেন। অভাবে জর্জরিত, বন্ধুমহলে অপ্রিয়, উচ্চাশায় বিফলিত একটি নিভন্ত প্রতিভার মর্মভেদী কাতরোক্তিই সেদিন শুনেছিলাম আমি—কোন শারীরিক যন্ত্রণার প্রকাশ নয়।

তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম। মঞ্চে আমি পিছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে দেখতে পাননি। গম্ভীর নির্লিপ্ততায় একঘর লোকের মধ্যে মোহিতলাল বসে আছেন দেয়ালঘেঁষা সোফার উপরে। চারপাশে অনেক সাহিত্যিক, অনেক সুধী। সম্মুখে প্রতীক্ষু সজনীকান্ত। কোনদিকে মোহিতলালের দৃষ্টিপাত নেই। উত্তাপের জন্য ঘর অন্ধকার রাখা হয়েছে। পাখা ঘুরছে। অগণিত জনতার যাতায়াতে চিহ্নিত জায়গাটি।

মহিলাবৃন্দ কিঞ্চিৎ বিমূঢ়। মোহিতলালের ভাবভঙ্গি ত্রাসজনক। মুখচোখ লাল। স্ফীত নেত্র। ভিতরে যেন একটা অব্যক্ত জ্বালা

হচ্ছে। সেটি তিনি চেষ্টা করছেন দমন করবার। অসহ্য কোন কষ্ট। গভীরস্বরে প্রায় নিস্তব্ধ ঘরে তাঁর দীর্ঘ উচ্চারিত 'আ-আ' ধ্বনি একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। সভাপতির ভাষণে অনেকেই বিষণ্ণ ও আহত। জগদীশ বাবু ও তদীয় সহধর্মিনী মিনুদেবী চিন্তাবিপর্যস্ত।

মোহিতলাল সোজা হয়ে বসে আছেন। নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গি তাঁর অটলদৃঢ়তার পরিচায়ক নিজ মতবাদে। যে যাই বলুক না কেন, কখনও তিনি নিজের মত বা পথ থেকে তিলমাত্র বিচ্যুত হবেন না। তাঁর যত ক্ষতিই হোক না কেন, তিনি compromise করতে রাজী নন। সঙ্গে দেখলাম উন্নাসিক অবজ্ঞাও একটু। নীরব উপবেশন তাঁর বলছে যেন—

"I am monarch of all I survey,
My right there is none to dispute;
From the centre all round to the sea
I am lord of the fowl and the brute."

তাঁকে বিশ্লেষণ করে এই ক'টি ভাবপ্রকাশ পাওয়া গেল সেদিন। তবু, আমার মনে হল, এই আপাতকঠোর মানুষটির কোথাও আছে নিবিড় কোমলতা। কোথাও আছে আকাশের দক্ষিণ বাতাস। তিনি লিখেছেন—

"যত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁথি যে সুরের মালা,
ওগো সুন্দর! নয়নে আমার নীল কাজলের জ্বালা।"
"এই অবনীর বেদনা নিবিড় সবুজ অন্ধকারে
পথ ভুলি বারে বারে,
কণ্টকে ফোটে রক্তকুসুম বাসনা সুরভি ঢালা।"

যাঁর লেখনী এত বেদনা ও মাধুর্য বাহক, তিনি অন্তরের কোন গোপন

আধারে নিশ্চয় সঞ্চিত রেখেছেন কমনীয় কবিপ্রকৃতি। চেয়ে নিলে এখানে হয়তো স্নেহ পাওয়া যাবে। আমার মধ্যে যে কাব্যপিপাসা আছে, অবশ্যই তার সমর্থন মিলবে ওই কঠোরস্বভাবে অন্তর্নিহিত কবিপ্রকৃতির কাছে।

কয়েকবার দৃষ্টিবিনিময় হ'ল। আমন্ত্রণের আভাস পেয়ে কাছে গেলাম। পরিচয় দিতে হ ল না। অতি সহজে সোফার হাতলে হাত রেখে নিকটস্থ হয়ে বল্লাম, "একদিন আপনার কাছে যাব।" তিনি নীরবে মাথা হেলালেন। মনে হ'ল তিনি আমার অতি আপন। শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে পৌঁছে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি চলে এলাম। জনতার মধ্য থেকে বা'র হতে হতে ভাবলাম, কে বলে মোহিতলাল রুক্ষ, অনমনীয়? তিনি সহজেই আপন হ'তে পারেন। যুগান্ত-সঞ্চিত শিল্পীর অকথিত অভিমান কবির কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। বিকৃত অভিমান রূপ ধরেছে অহঙ্কারের। রূঢ়তার আবরণে আহত মনকে আবৃত রেখেছেন তিনি। কাছে যেতে হ'বে। তাঁকে সমাদর জানাতে হ'বে। তবেই মন মেলে দেবেন তিনি।

কেটে গেল দীর্ঘদিন। কর্ম, নৈষ্কর্ম, প্রবাস, অসুস্থতার মধ্যে সময়ের দ্রুত গতি—যতিচিহ্নিত পরিক্রমা নয়। বেহালা অনেকদূর। বেহালার পথ চিনি না। গাড়ী চলে না সেখানে। কবির কাছে যাওয়া হয় না।

ইতিমধ্যে 'কমলা বুক ডেপো' থেকে আমার 'সপ্তসাগর' নামে একখানি অমনিবাস পুস্তক প্রকাশ আয়োজন হচ্ছিল। সেখানে কবির পুত্রকে দেখলাম। যাওয়ার তাগিদ পেলাম। 'কমলা' মোহিতলালের বিদেশী গল্পের অনুবাদ ওই একসময়ে প্রকাশ করছিলেন।

সুযোগ মিলে গেল যাবার অকস্মাৎ। ক্যালকাটা হোটেলে তখন বসত 'উজ্জয়িনী' ক্লাব। শরৎস্মৃতির দিনে সভানেতৃত্ব করতে যেয়ে আলাপ হয়ে গেল 'বাতায়ন' পত্রিকার দলের সঙ্গে। পূর্বে 'বাতায়নে' লিখলেও দলকে চিনতাম না। তাঁরা আলাপ করে যাতায়াত করতে লাগলেন। শুনলাম মোহিতলালের ওখানে প্রায় প্রতি রবিবার তাঁরা যান। তাঁদের নাম রমেশ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাস, অমরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। মধ্যমণি ছিলেন স্বর্গগত বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁরা আমাকে জানালেন, মোহিতলাল কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, "কই হে, তোমাদের বাণী রায় তো এল না? আসবে যে বলেছিল?"

আহ্বান এসেছে। এক রবিবার বহির্গত হ'লাম কবিতীর্থে। বাস, সাইকেল-রিক্সার শরণ নিয়ে গেলাম পল্লীগ্রামের একটি উদ্যান বাটীকায়। শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন পরিবেশ। একতলা বাড়ী, চারধারেই গাছপালা। উঁচু রোয়াকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল। শুনলাম কলিকাতা থেকে বহুলোক এখানে আসেন দেখা করতে। মোহিতলালকে ঘিরে একটি জটলা বসে নির্জন বনালয়ে। তিনি যথেষ্ট আতিথ্য করেন।

ঘরের মধ্যে মোহিতলালের ছোট ছেলে বসাল আমাদের, বোধহয় মেজেতে সতরঞ্চ পাতা ছিল। আরও কেউ কেউ এসেছিলেন দেখা করতে। কবির প্রাক্তন ছাত্র একজন, সদ্য পরিণীতাকে নিয়ে সন্দেশ হাতে এসেছিলেন। চমৎকার চা, কিসমিস্ বাদামযুক্ত মোহনভোগ, পাঁপরভাজা এল সবার জন্য। সিগারেটসেবীদের জন্য সিগারেট।

কবি বসেছিলেন নতমস্তকে বইখাতায় চোখ রেখে। ঘরোয়া বেশ তাঁর। বাঁ হাত শুনলাম অবশপ্রায়। তিনি যে অত্যধিক রক্তচাপে বিপন্ন, পরে বুঝলাম।

প্রথমে সাংসারিক ও জাগতিক কথা চলল অভ্যাগতদের সঙ্গে। নিন্দামুখর হয়ে উঠল রসনা তাঁর। মুখ ক্রুর। চোখে জ্বালা। আবেগমত্ত রুক্ষ ভাষণ। এক একটি মন্তব্যের উগ্রতায় শিউরে উঠতে হয়।

সংক্ষেপে বুঝলাম; তিনি কংগ্রেসে অবিশ্বাসী। গান্ধীজী বাংলা ও হিন্দুর ক্ষতি করেছেন বলে তিনি ক্রুদ্ধ। নেতাজী তাঁর আদর্শ পুরুষ। রাজনীতির বিতর্ক তাঁর মনোমত বস্তু। পারিষদের সোৎসাহ সায়ের মধ্যে জ্বালাময় ভাষায় অজস্র কথা বলে গেলেন তিনি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, সরকারী নীতি, বাংলা বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে তীক্ষ্ণ কঠিন মতামত দিলেন সমালোচক মোহিতলাল।

সাহিত্য অধোগতিগ্রস্ত। সাহিত্যিকেরা মূর্খ। রবীন্দ্রনাথের পরে কিছু আর লেখা হয়নি। তথাকথিত প্রগতি সাহিত্য দেশের সর্বনাশ সাধন করছে। বাংলা ভাষা বিপন্ন। নৈরাশ্য-হতাশামগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ রইলাম। ইংরাজি ভাষার নাকি দাসত্ব করছি আমরা। ভবিষ্যতে কোন আশা নেই।

তাঁর যুক্তি খণ্ডিত করা যেত বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু, আমি নীরব রইলাম। মনে হ'ল তিনি সুস্থ মস্তিষ্কে নেই। বিকৃত প্রতিভার সঙ্গে বিতর্ক নিষ্ফল।

কিন্তু, আজ বুঝেছি তিনি সেদিন যাঁদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যাঁরা সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন, সাহিত্যিক মোহিতলালের যোগ্য সঙ্গী তাঁরা কেউ নন। তাঁরা অধিকাংশ অফিসে লেজার ঠিক রাখেন। বড় কর্তার পদলেহন করেন। বড় জোর না-পড়া বইএর বিষয়ে মন্তব্য পাশ করেন। তাঁরা মহোল্লাসে পরচর্চা ও পরনিন্দা কীর্তনে অভ্যস্তভাবে সময় কাটাচ্ছিলেন। মোহিতলালকে তাঁরা উত্তেজিত

করে কবির উত্তেজনা উপভোগ করছিলেন। তাঁরা যা, সেইমত পরিবেশ রচনা করে নিচ্ছিলেন। প্রতিভার পক্ষেও সঙ্গ নির্বাচন প্রয়োজন হয়।

সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। যিনি বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষী পরিবৃত, সম্পদখ্যাতিমুখর শান্ত জীবন যাপন করবেন, আজ তাঁর একি পরিণতি ?

মোহিতলালের প্রতিভাদীপ্ত, সফল মধ্যদিনের ইতিহাস আমার জানা নেই। তখন যাঁরা স্তবগুঞ্জন করতেন, তাঁরা বলতে পারবেন। আমি দেখেছিলাম ধ্বংসোন্মুখী প্রতিভার শেষ কয়েকটি দিনের অস্তরাগ। চরম বেদনায় বিলেপিত, প্রতিহত জীবনের অন্তিম প্রচেষ্টা—আবার নিজের চারপাশে নূতন স্রষ্টার সমাবেশ, আবার সাহিত্যের নবীনরূপ প্রদান।

তাঁর দুঃখ, তাঁর অভাবের জন্য তিনি নিজে নাকি দায়ী। একথা তাঁর বন্ধুজনের মুখে শুনেছিলাম। আমি সত্য মিথ্যা কিছুই জানি না। সেদিন প্রথমে আমার ভাল লাগেনি, স্বীকার করি। কোনক্রমে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে বাঁচলাম।

তারপরে দেখা দিল অন্য লোক—কবি মোহিতলাল। নিজের রচনার দুর্লভ মণিমুক্তা তিনি নিক্ষিপ্ত করলেন সেই লোকগুলির কাছে। আবার সেই আবৃত্তি শুনলাম।

রাত্রি গভীর হয়ে গেল। তিনি বিদায়ে অনিচ্ছুক। এর মধ্যে অন্তঃপুরে কবিপ্রিয়ার সুন্দর হাসিমুখ দেখে এলাম।

আমার লেখা সনেট-কবিতা দেখে মোহিতলাল বল্লেন, "ঠিক সনেট হয়েছে তো ?"

বল্লাম, "দেখুন না।"

অতি আগ্রহে ঝুঁকে তিনি গুণে দেখে বল্লেন, ঠিকই আছে। তারপরে প্রসন্ন হয়ে নিজের কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন—কালাপাহাড়, নূরজাহান, শবসাধনা ইত্যাদি। ধীরে ধীবে কোমল কবিতায় নেমে এলেন।

কোন কথায় তিনি আমাকে বল্লেন, "তোমরা আধুনিক মেয়েরা কিছুই বোঝনা।"

তারপরে, দারার মুণ্ড দর্শনে আওরংজেবের উপরে একটি কবিতা পাঠের পরে উপস্থিত সকলেব মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি চুপ করে রইলাম। অবশেষে তিনি আমাকেই প্রশ্ন করলেন, "তুমি চুপ করে আছ কেন? এর মধ্যের অর্থ কি বুঝেছ, বল দেখি?"

আমি উত্তর দিলাম, "আমি তো বুঝিনা কিছু। তবে, জিজ্ঞাসা করছেন কেন আমাকে?"

উপস্থিত একজন বললেন, "এবাব মোহিত বাবু ঠিক মুখের মত জবাব পেয়েছেন।"

মোহিতলাল হাসি গোপন কবে পরাজিত ভঙ্গিতে মাথা নামালেন। পরাজয় তাঁর ভাল লাগল, ভাল লাগল অভিমান। মানুষ মোহিতলাল!

আমি চিরদিনের উদ্ধত। মোহিতলালের ব্যবহারে প্রশ্রয় ছিল। যেন তাঁর প্রকৃত সত্তাটি আমি ধবি ধরি করছি, সে সত্তা মোটেই রুক্ষ সমালোচকের নয়। ভয় চলে গিয়েছিল। অনেক স্পষ্টভাষণ আমি করেছিলাম। তাঁর ব্যবহাবের সমালোচনার স্পর্ধাও ছিল। আজ মনে করে দুঃখ হয়।

আমি বলেছিলাম, "যে যা ইচ্ছা করুক না, আপনি তাতে এত উত্তেজিত হয়ে নিজের ক্ষতি করছেন কেন? আপনি সাহিত্যিক, আপনি পাগলের মত হয়েছেন কেন?"

এই কথায় সত্যই তিনি পাগলের মত চীৎকার করে উঠেছিলেন, "কি বলছ তুমি? আমার দেবতা যখন সর্বত্র অপমানিত হচ্ছেন, তখন আমি চুপ করে থাকতে পারি?"

সাহিত্যদেবতার অপমান চিন্তা করেই তিনি প্রায় উন্মাদের মত ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করেছিলেন। অত্যধিক রক্তচাপ যে তাঁর আছে, তখনি বুঝলাম।

প্রতিক্রিয়া দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইলাম। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে প্রকৃতিস্থ করলেন।

ভাবলাম, ইনি কি করে লিখেছেন—

"নিঃসঙ্গ হিমাদ্রি চূড়ে জ্বলিয়াছে হর-কোপানল,
মদন হয়েছে ভস্ম, রতি কাঁদে গুমরি' গুমরি'।
উমা সে গিয়েছে ফিরে, অশ্রুচোখ ম্লান ছলছল---
ফুলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন উপরি;
আঁখিতে আঁকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ পক্ক বিম্বফল।
শ্মশানে পলায় যোগী তারি ভয়ে, ধ্যান পরিহরি'—
বধূর দুকূলে তবু বাঘছাল বাঁধা প'ল—আহা, মরি মরি!"

আমার লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে মোহিতলাল বললেন, "তুমি জান না, যখন সাহিত্যের অবনতি দেখি, আমি পাগল হয়ে যাই। বর্তমান জগতে কোথাও সুন্দরের আহ্বান নেই। আধুনিক একটি ছেলেমেয়ের মধ্যেও প্রকৃত সাহিত্যবোধ নেই। থাকবে কি করে? কোথাও গভীরতা নেই। কোথাও পড়াশোনা নেই। বর্তমানের জীবনে সাহিত্য জন্মাতে পারে না।"

দ্রুতগতিতে বলে চল্লেন, "কেমন করে কোথা থেকে ছিট্‌কে এসে তোমার মধ্যে একটা আসল জিনিষ পড়েছে। কি করে এটা সম্ভব হ'ল জানি না।"

অন্যমনস্ক ভাবে বার দুই বললেন, "কি করে যে এল বুঝতেই পারছি না। সাহিত্য কেমন করে যেন তোমার মধ্যে এসে গেছে। লেখবার ক্ষমতা এ যুগে এল কি করে?"

মোহিতলালের এই কথায় বর্তমানে তাঁর গভীর অবিশ্বাস বুঝলাম। আধুনিক ছেলেমেয়েরা যে লেখক বা সাহিত্যিক হ'তে পারে, এ তথ্য তাঁর মনে স্থান পায় না।

এ ছাড়া, দেখলাম তাঁর গুণগ্রাহিতা, অনুসন্ধিৎসা। মনোযোগ সহকারে অন্যের লেখা শোনা, সমালোচনা করা, উৎকর্ষবিধানের পথ বলে দেওয়া, সর্বোপরি ভাল দেখলে অকৃত্রিম প্রশংসা, এমন কোথাও আমরা পাই না। এই বিজন বনালয় তাঁর যোগ্য নয়। তিনি শিষ্যপরিবৃত সাহিত্যগুরু হ'লে তবেই তাঁর যথাযোগ্য স্থান মেলে। তিনি ছোটকেও সমাদর করতে জানেন। তাঁর জীবনবেদ সাহিত্য। সামান্যর মধ্যেও অসামান্যকে খুঁজে দেখবার প্রবৃত্তি আছে তাঁর। কিন্তু তাঁকে দিতে হবে আনুগত্য, তবেই তিনি নিকটে আসবেন।

সাহিত্য বিষয়ে সেদিন মোহিতলাল অনেক আলোচনা করেছিলেন। রচনার শৈলী হওয়া উচিত সুন্দর। ব্যাকরণগত দোষমুক্ত রচনা হওয়া চাই। ভাষার দৈন্য ভাবকে আঘাত করে। স্বনামধন্য কয়েকজন লেখকের দোষত্রুটির উল্লেখ তিনি করে গেলেন উদাহরণতঃ। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত অকাট্য। তিনি শুদ্ধ ভাষার পক্ষপাতী হ'লেও চলতি কথার দাবী অস্বীকার করেন না। ইডিয়ম ঠিক থাকলে আপত্তি নেই।

দেখলাম তাঁর মন শিক্ষকের মন। শিক্ষা দেবার অদম্য ইচ্ছা সে মনে সর্বদা জাগরুক। তিনি বিদ্যোৎসাহী।

ব্যঙ্গের সঙ্গে রঙ্গ ও রসিকতাও ছিল কথায় তাঁর। কিন্তু মনের ভগ্ন আশা, সহনশীলতার অভাব ইত্যাদি অধিকাংশ সময়ে তাঁকে নির্মম

বিচারক করে তুলেছিল। প্রতিহত বাসনা ফিরে এসে নিজেকেই আঘাত করে যাচ্ছিল বারে বারে।

যে স্তাবকের দল তাঁকে তোয়াজ করতেন, তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন জীবনে বিফল। বিফলতার কারণ তাঁদেব সাফল্যের যোগ্যতা ছিল না। ঈর্ষা ও নিন্দা দ্বারা তাঁরা নিজেদের গাত্রদাহ নিবৃত্ত করতেন। পরস্পরের মধ্যে কথা লাগানো ছিল তাঁদের stock in trade, এঁদের আওতায় বিহ্বল, ভ্রষ্ট মনীষীকে দেখলাম। লেখনী অকৃপণভাবে সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টি করে চলেছে তখনও। কিন্তু, হায়, কবি যে হারিয়ে গেছেন।

সেদিন কিন্তু সেই শুক্লা রাত্রির চন্দ্রিকাপ্লাবিত যামে কবি আবার জেগেছিলেন। বাগানবাড়ী যত্নের অভাবে অরণ্যে পরিণত হয়েছে। তবু খোলা জানলায় বাতাপিগাছ উপহার পাঠাচ্ছে মৃদু গন্ধ। কবি তাঁর তিনখানি কাব্য গ্রন্থ 'স্বপন পসারী', 'বিস্মরণী' ও 'স্মরগরল' থেকে কবিতা শোনালেন। পাণ্ডুলিপির ও সাময়িকীর পৃষ্ঠা থেকেও কাব্য পাঠ হ'ল। 'স্মরগরল' বইটিই বেশী পড়েছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থায় শব ও শ্মশান নিয়ে কবিতা পড়ছিলেন। হঠাৎ সুরু করলেন—

"বধুরে আমার দেখিনি তো চোখে শুনেছি তার
অপরূপ রূপ, চোখের চাহনী চমৎকার।"

মনে হ'ল, এমন কবিতার এমন পাঠ শুনিনি আগে। তখন চাঁদের আলোর সঙ্গে উতলা বাতাস মিলেছিল। সেই কবিতা আজ এখনও, এই মুহূর্তে আমার শ্রবণমন আচ্ছন্ন করে বাজছে—

"অপরূপ রূপ, চোখের চাহনী চমৎকার।"

রাত্রি প্রায় দশটায় বিদায় নিলাম। গেটে এলেন কবি। জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কি করবেন?"

ছাদ দেখিয়ে বললেন, "মুখ হাত ধুয়ে একা কিছুক্ষণ ছাদে বসে থাকব। এই ছাদটুকু আছে, তাই বেঁচে আছি।"

বিদায়ের আগে বললাম, "যতই বলুন না কেন, জীবন এখনও আপনাকে অনেক কিছু দিতে পারে। হৃদয়ঘটিত দুর্বলতার সময় এখনও যায়নি।"

মোহিতলাল হাস্য গোপন করে বললেন, "আমিই আমার একমাত্র মালিক। পৃথিবীতে কারুর ক্ষমতা নেই আমাকে দুর্বল করে। স্বয়ং বিধাতাও নয়।"

আমি বলেছিলাম রাস্তায় নেমে; "Beware, beware!"

মোহিতবাবু হাসতে হাসতে হাত তুলে বলেছিলেন, "কখনই না।"
সেই সময়ে এই রুক্ষভাষী, কঠোর মূর্তি, প্রৌঢ় ব্যক্তির বিশাল গভীর চোখ দুটিতে দেখতে পেয়েছিলাম সরস তারুণ্য ও প্রেমময় কবি হৃদয়।

সেই শেষ দেখা। আর কোথাও তিন বছরের মধ্যে তাঁর দেখা মেলেনি। আমি চেষ্টাও করিনি। চাঁদের আলোয়, বিজন বনালয়ে ক্ষণকালের জন্যও যে কবি মানুষটি জেগে উঠেছিলেন, তিনি হয়তো দ্বিতীয় সাক্ষাতে নেবেন ভিন্নরূপ। সাক্ষাতের প্রথমার্ধের অপ্রিয় সমালোচক হয়তো আবার ফিরে আসবেন।

আর, একদিনের অন্তরঙ্গ ও দীর্ঘ আলাপ মানুষকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। আলোকিত একটি ক্ষণের দেখা যুগব্যাপি তমসার অন্তরঙ্গতা পরাস্ত করে। মোহিতলালের কাছে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু চেনার পক্ষে ওই যথেষ্ট।

বাতাপিগন্ধ-সুরভিত বাতাসে গ্রাম্যপথ ধরে ফিরে এলাম অনেক সম্পদ নিয়ে। তিনি আমাকে কবিতা শুনিয়েছেন। খেজুরগাছের

পাশে, টীনের ঘরের ছায়ায়, পানা পুকুরের ধার ধরে চলেছে বড়িশার পথ। পায়ে পায়ে বেজে উঠছে ক্লান্ত, মধুর কবিকণ্ঠ—

"আমারে তোমরা ভুলে যেও, ভাই!
এসেছিনু পথ ভুলে'—
পান করিবারে জাহ্নবী বারি
কীর্তিনাশার কূলে!
বহু জনমের ব্যর্থ পিপাসা
এবার পূরিবে, মনে ছিল আশা,
ভাঙা মন্দিরে বেঁধেছিনু বাসা
পুরানো বটের মূলে;
প্লাবনের মুখে ভেসে গেল সব
কীর্তিনাশার কূলে!"

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পূর্ব্বে স্বর্গগত কথাটি বসাবার প্রয়োজন এত শীঘ্র হ'তে পারে বলে কেউ ধারণা করতে পারেন নি। বন্ধুবর্গকে এপ্রিল ফুলের বিস্ময়-চমকে মূঢ় করে অন্তরীক্ষে সকৌতুক হাসি যিনি হাসছেন, সেই শিশু-স্বভাব প্রতিভাশালী লোকের সঙ্গে আমার বিগত সাত-আট বৎসর পরিচয় ছিল।

ঘাটশালায় দেখা হয়—বিজয়া সম্মিলনীতে হাইস্কুলের ফটকের পাশে। আমরা জেনেছিলাম 'পথের পাঁচালীর' রচয়িতা ওখানে আছেন। আমার ব্যগ্র মন তাঁকে খুঁজে ফিরছিল।

তারপরে ঘাটশীলার পথে-বনে, সকাল-সন্ধ্যায় পরিচয় নিবিড় হ'ল। অবশেষে কলিকাতায় জের চলে এল। নিজের স্বভাব মাধুর্য্যে বিভূতিবাবু আমাদের পারিবারিক অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলেন। আমি বিভূতিবাবুর বন্ধুত্ব সৌভাগ্য বলে মনে করেছিলাম।

তাঁর প্রথম পরিচয় আমার মাতা লেখিকা গিরিবালা দেবীর সঙ্গেই বেশী ছিল। তারপরে গায়ের জোরে আমি তাঁর সঙ্গে সমকক্ষ ভাবে মিশতে আরম্ভ করলাম, বয়সের অত পার্থক্য সত্বেও। তিনি হয় তো আমাকে স্নেহ করতেন।

এ সমস্ত কথা বলার কোন সার্থকতা নেই। তবে, অকস্মাৎ বিভূতি-ভূষণের মৃত্যুর পর আমি যে স্মৃতি কথা রচনা করতে বসেছি তার কারণ আমার তাঁকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রবাসের পথে, দেশের গৃহে, নিমন্ত্রণে, সভা-সমিতিতে, নির্জ্জনে,

জনতায় নানা ভাবে বিভূতিবাবুর সঙ্গলাভের দুর্লভ আনন্দ লাভ করেছি। তাঁর সাহচর্য ছিল লঘু পুষ্পসুকুমার—সঙ্গীর উপর কখনও তিলমাত্র ভার অর্পণ করত না।

কিন্তু বোধহয় সর্বাপেক্ষা কঠিন কাজ বিভূতিবাবুর যথার্থ চরিত্র অঙ্কন করা। 'যিনি প্রাত্যহিক জীবনে অত সহজ ছিলেন, তাঁরই ছবি আঁকা এত কঠিন কেন? আমার মনে হয়, তাঁর শৈশবের বন্ধু, যৌবনের সঙ্গী, প্রৌঢ়ত্বের অন্তরঙ্গ, কেউই এই অতিশয় সাদাসিধে লোকটিকে এক কালিতে এঁকে দিতে পারবেন না। রত্ন-প্রসূ বঙ্গসাহিত্যে এমন সহজ সাহিত্যিক কেউ ছিল না। কথায় মোচড় নেই, ব্যবহারে জটিলতা নেই, চরিত্রে গোপন কক্ষ নেই—এমন লোক, যিনি সহজে অন্দরের রান্নাঘরে পিঁড়ি টেনে বসতে পারেন, তেল-নুনমাখা মুড়ির বাটি অসঙ্কোচে যাঁর হাতে তুলে দেওয়া যায়—তাঁর বিষয়ে এত ভাবছি কেন? বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রথায় তো অনায়াসে লিখে যেতে পারি, অমায়িক, সদালাপী, নিরহঙ্কার, সহজ মানুষ বিভূতিভূষণ—তাঁর ওই রচনার মতই সোজা।

হাতকাটা শার্ট, কেডস্ পায়ে, হাতে একখানা গাছের ডাল। ধুলিধূসরিত বিভূতিভূষণ 'ঘাটশীলায়' আমাদের বাড়ীর বারান্দায় এসে মেজের উপরে বসে পড়লেন। বড় বৌদির গায়ের কাপড় সরে গিয়েছিল, তবু তিনি লজ্জিত হ'লেন না। সাংসারিক খুঁটিনাটির আলোচনা থামাবার প্রয়োজন হ'ল না। কাজের মানুষ কাজ সরিয়ে রাখল। একমুহূর্তের মধ্যে মনে হ'ল জায়গাটি উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেল। এই বিভূতিভূষণ।

আবার মনে পড়ে—'ডাহিগোড়ায়' বিভূতিভূষণের পাড়ায় একদিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। তখনও তাঁকে চিনতাম না। ছোট পাহাড়ী নদীর ধারে নির্জন ঝোপের মধ্যে একজন ভদ্রব্যক্তি মাটীর ঢিবির

উপরে একখানা বই হাতে বসে আছেন। তিনি আমাদের দেখতে পেলেন না। সম্পূর্ণ উদাসীন ভঙ্গি তাঁর—অথচ হাতের বইতে মন সংযোগ রয়েছে একান্ত ভাবে। মুখে নিবিড় প্রশান্তি। সাধারণ চেহারা—তবু কোথায় যেন অসামান্যতার ছাপ আছে। হঠাৎ মনে হ'ল ইনি কে? সাধারণ মানুষ তো এখানে এভাবে বসে থাকেন না। সেই বিভূতিভূষণ।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ঘন শালবনের মধ্যে কাল কাল পাহাড়। নির্জন বনভূমি চারপাশের মহুয়া গন্ধে বিহ্বল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিহ্বল সাহিত্যিক চারপাশের জগৎ ভুলে বসে আছেন। সমাহিত ভাব তাঁর—পাশে যে আমি বা আমার মা বসে আছি এ বোধ সাময়িক ভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে তাঁর। খস্খস্ শব্দে ভয়বিহ্বল হয়ে উঠছি আমরা। তিনি অবিচলিত। তিনিও বিভূতিভূষণ।

কলিকাতায় বোমা পড়ছে—বিভূতিবাবু সযত্নে কলিকাতা পরিহার করছেন। আবার বন্য জন্তুসঙ্কুল অরণ্যে শিকারী ভীত, বিভূতিবাবু সানন্দে গমন করছেন। সাপ, চোর ইত্যাদির অমন ভয়শূন্য ব্যক্তি কমই দেখা যেত।

বিভূতিবাবু কি তাহলে ছিলেন দু'মুখো দেবতা? একের বর্ণনায় অন্যের বর্ণনা মেলে না কেন?

প্রকৃত শিল্পীর মত বিভূতিভূষণ ছিলেন নানা স্ববিরোধী ভাবের সংমিশ্রণ। তাই অনায়াসে তাঁর প্রকৃতি বলে দেওয়া সহজ নয়।

বিভূতিবাবু আহার ভক্ত ছিলেন—বিলাসের খাদ্য নয়, যে কোন খাবার বস্তু। এই একটিমাত্র সাধারণ দুর্বলতা ছিল তাঁর। নই'লে সন্ন্যাসীসুলভ নিস্পৃহতারও অবকাশ ছিল তাঁর। কতকগুলি উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি সাধারণ মানুষ থেকে তাঁর পার্থক্য সৃষ্টি করেছিল নিঃসন্দেহে।

বিভূতিভূষণের জীবন-কাহিনী অনেকেই জানেন। বাল্যকালে অবস্থা বিপর্যয় ঘটেছিল তাঁর পিতৃবিয়োগে। নিজের চেষ্টায় তিনি মানুষ হ'ন। তাঁর প্রথমা পত্নী গৌরী দেবী বিবাহের এক বৎসরের মধ্যে বিগতা হ'ন। নিঃসন্তান বিপত্নীক অবস্থায় বিভূতিভূষণ কুড়ি বৎসর অতিবাহিত করেন। ইতিমধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হিসাবে বঙ্গ সাহিত্যে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তারপর ১৯৪০ সালে বিভূতিভূষণ দ্বিতীয়া পত্নী কল্যাণী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর 'বাবলু' নামে একটি মাত্র পুত্র সন্তান আছে।

কল্যাণী দেবী স্বামীর থেকে বয়সে অনেক ছোট। বন্ধুজন এ ব্যাপার নিয়ে পরিহাস করতেন। কিন্তু বিবাহটি অতি স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। বনগ্রামে কল্যাণী দেবীর পিত্রালয়ে একটি সাহিত্য সঙ্ঘ ছিল। কল্যাণী দেবী নিজেও লিখতেন। সেই সূত্রে কল্যাণী দেবীর সঙ্গে বিভূতিভূষণের আলাপ হয়, তাঁর সেবাযত্নে বিভূতিভূষণ মুগ্ধ হ'ন। কল্যাণী দেবীর এই বিবাহে প্রবল অনুরাগ ছিল। বিভূতিবাবু একদিন কথাসূত্রে আমাকে বলেন, "আমার বয়স হয়ে গিয়েছে। কল্যাণী অনেক ছোট। তা ছাড়া ও অবস্থাপন্ন ঘরের আদুরে মেয়ে। আমি তো পাড়াগাঁ ছাড়া থাকতে পারব না। অতি সহজ অবস্থায় আমি থাকব। তা, ও সবটাতে রাজী ছিল। এমন কি নদী থেকে ঘড়া করে জল আনতেও রাজী। আর, আমি জানতে পেলাম কল্যাণী আমাকে ছাড়া বিয়েই করবে না জীবনে। আমি বিয়ে করব না এমন প্রতিজ্ঞা করিনি। তাই বিয়েই করলাম।" তাঁর সহজ অনাবিল হাস্য, যা এক মুহূর্তে তাঁর সমস্ত মুখকে অদ্ভুত সৌন্দর্যদানে সক্ষম ছিল—সেই হাস্যের সঙ্গে অনায়াসে বিভূতিবাবু বললেন, "অমুকও কিন্তু রাজী ছিল। তার বাবাই বিয়ে দিলেন না। আমি কি করব, বলুন ?"

'অমুক' একজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্র মহিলা। কল্যাণী দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পূর্বে বিভূতিবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। যতদূর জানি, ভদ্র মহিলা বিভূতিবাবুকে বিবাহে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি এম. এ. পাশ করেছিলেন ও স্বচ্ছল পরিবারের কন্যা ছিলেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগ বিভূতিবাবুর সঙ্গে আলাপের মূল। আশ্চর্যের বিষয়, বয়স্থা কন্যার ইচ্ছা সত্ত্বেও উচ্চপদস্থ পিতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করেন নি জামাতা হিসাবে! 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক' তখন লেখা হয়েছে—বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী হিসাবে বিভূতিভূষণের পরিচিতি। অবশ্য খ্যাতি অপরিসীম হ'লেও অর্থ হয়েছিল তার পরে। ব্যবহারিক জীবনে বিভূতিভূষণ ছিলেন সামান্য স্কুল মাষ্টার। কন্যাপক্ষে সদ্য পাশ করা ডেপুটীর সন্ধান চলছিল। বিভূতিবাবু অতি অকপটভাবে হাসতে হাসতে কথাগুলো ব্যক্ত করলেন। তাঁর সেই হাসির মধ্যে গ্লানির চিহ্নমাত্র ছিল না। ব্যাপাবটা এতই হাস্যকর যে আমি চুপ করে রইলাম কন্যার পিতার মূল্য আরোপের মানদণ্ড দেখে। গভীর স্নেহে বিভূতি বাবু বলে গেলেন, "অমুকের বিয়ে হয়েছে। স্বামীকে ছেড়ে কেমন করে থাকে ও? ওদের মধ্যে কি ভালবাসা নেই? কল্যাণীর সঙ্গে একদিন দেখা না হ'লে আমার তো মনটা কেমন খারাপ হয়ে যায়!"

স্ত্রীকে বিভূতিবাবু গভীর স্নেহের সঙ্গে দেখতেন। বয়সে বেশী ছোট পত্নীর পর্যায়ে নেমে নব বরসুলভ চটুলতা তাঁকে করতে দেখিনি। অত্যন্ত সহজ স্নেহে নিজের পর্যায়ে থেকেই তিনি সহধর্মিণীকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। বিবাহের পরে পরে তাঁদের দেখেছিলাম। কল্যাণী তখন চঞ্চলা কিশোরী, নূতন বিবাহের পরে অভীষ্টকে পাবার সার্থকতায় উচ্ছ্বসিতা, প্রেমে পরিপূর্ণা। কখনও ঘাটশীলায়

সাঁওতালবাড়ী পিঠের চালের গুঁড়ো বানাতে ছুটছেন, কখনও বিবাহ বার্ষিকীতে বিভূতি বাবুর উপহার নীলাম্বরী শাড়ী পরে পিকনিকে, কাজকর্মে, হাসি-ঠাট্টায় সকলকে একাই মাতিয়ে রাখছেন। কলিকাতা থেকে বিভূতিবাবুর ফিরতে সামান্য দেরী হ'লে পাগলের মত করছেন। উৎসব বাড়ীতে আমাকে বারে বারে আড়ালে জিজ্ঞাসা করেছেন, "আচ্ছা, সত্যি করে বলুন তো, ওঁর বিপদ হয়নি কিছু? আমার ভয় করছে।" সেদিন স্বামী সম্পর্কে তাঁর মনোভাব দেখে মনে হয়েছিল আমার:—

"বুকে তায় মালা করি রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়া সনে মলয়ায় যায় সে উড়ি"—

এই ভাবধারা গ্রহণ করতেন বিভূতিবাবু প্রশান্ত মনে। তাঁর মধ্যে প্রশান্তির যে বিভিন্ন রূপ দেখেছিলাম, স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার তার মধ্যে একটি।

নারীর প্রতি বিভূতিভূষণের মনোভাব ছিল আশ্চর্য সম্ভ্রমপূর্ণ। ভ্রমেও কোন মহিলার সম্বন্ধে অভদ্র উক্তি আমি তাঁর মুখে শুনিনি। রোমান্টিক প্রেমের চিত্র তাঁর রচনায় ছিল না বল্লেই চলে,—নারীর জননী ও সেবিকার কল্যাণময়ী রূপই তাঁর চক্ষে ধরা পড়েছিল। নিষিদ্ধ প্রেমের নায়িকা তিনি দেখতে পেতেন না। যাকে ভাল লাগতো অকপটে স্বীকার করতেন। সুন্দরীর রূপের প্রশংসা করতেন শিশুর মত সারল্যে। এমন শুচিতা দুর্লভ ছিল। এইদিকে এই সাধারণ মানুষটি প্রধান সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন মহিলাদের প্রতি তাঁর অপূর্ব সংযত ব্যবহারে। বহু শতাব্দী স্ত্রী-স্বাধীনতার দেশে বাস করলে তবে এমন হয়।

বিভূতিভূষণের কথা বলতে বসলে মনে হয়, আরও বলি। তাঁর

আন্তরিক সহৃদয়তার উপমা কোথায়? সদালাপী, সর্বদা আনন্দময় ব্যক্তি ছিলেন—বয়স হয়েছিল ভ্রমেও বোঝা যেত না।

বিভূতিভূষণের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কৌতুকপ্রদ ছিল। আমি ওঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও, অতি পরিচয় সত্ত্বেও তিনি কখনও আমাকে 'তুমি' বলে ডাকেন নি। তাছাড়া, তিনি সমবয়স্কের মত আমার সঙ্গে ব্যবহার করতেন, এমন কি, কখনও বা বয়স্ক জনের প্রতি সম্ভ্রমের প্রকাশ দেখেছি। অথচ, মন খুলে গল্প করতেন, অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। অনেকটা সমবয়স্ক ব্যক্তির মত ব্যবহার পেয়েছি ওঁর কাছ থেকে। সেটাও তাঁর বিশেষত্ব।

যত কথাই বলি, লোকটিকে ঠিকভাবে প্রকাশ করা চলে না। বেশী কথা দিয়ে ছবি যেমন আঁকা যায়, আবার ছবি তেমন ঢাকাও যায়। শুধু মনে হয়, যাঁরা দেখেন নি, তাঁরা কতটা দেখেন নি। 'অপরাজিতের' ছত্রে ছত্রে যে অপুর আত্মদর্শনের ছাপ ধরা পড়ে, সেই অপু যদি রচয়িতা নিজেই হ'ন, তাহ'লে কি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল তাঁর, কতটা নির্লিপ্ত নিষ্ঠুরতা ছিল! আবার 'পথের পাঁচালীর' মত বই যিনি লিখে গেছেন, সেই অসামান্য প্রতিভাবান সাহিত্যিক কতটা অনাড়ম্বর সহজ ছিলেন! একাধারে দুইটি ব্যক্তিত্বের সমাবেশ ঘটেছিল। স্রষ্টার আত্মপ্রত্যয়ে মিশেছিল শিশুর সরলতা। এমন একজন লোক আমাদের মধ্যেই ছিলেন। আমরা অনেকে তাঁকে দেখিনি। তাঁকে না দেখে নিজেরাই বঞ্চিত হয়েছি। আমাদের মান ও অপমানে সদাপ্রসন্ন সাহিত্যিক কখনও বিচলিত হ'তেন না। তাঁর মুখে চির প্রসন্ন মধুর হাসি, সৌম্য প্রশান্তির অভাব কোনদিনই ঘটে নি। তবু, আমরা তো তাঁকে আর একটু সমাদর করতে পারতাম।

'There lies the rub'—অতি সহজ যা, তাই বোঝা শক্ত। শাদা

কাটের পোষাকে সব চেয়ে দক্ষ দর্জির প্রয়োজন হয়। সোজা রাস্তায় দূরত্ব অনুমান করা কঠিন। চোখের সামনে পাহাড়—সোজা রাস্তা, যত অগ্রসর হও, তত সে পিছিয়ে যায়। সহজ দিনযাত্রার ছবি 'পথের পাঁচালী' সহজে লেখা যায় না। বিভূতিভূষণের মত প্রতিভার আবশ্যক হয়।

বিভূতিবাবুকে যে কোন লেবেল-চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। কারণ, প্রথমতঃ, তিনি ছিলেন বিভিন্ন ধাতুর উপাদানে পরিগঠিত স্ব-বিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ। দ্বিতীয়তঃ, তিনি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের অধীন ছিলেন। তৃতীয়তঃ, জলের মত বন্ধুত্বের পাত্রে তিনি ছিলেন নানা-রূপ-পরিগ্রহকারী।

শেষের কথায় তাঁকে ব্যক্তিত্বহীন ব্যক্তি বলে প্রতিপন্ন করা হচ্ছে না। বরঞ্চ, তাঁর নিজস্বতা এত বেশী ছিল যে-কোন সঙ্গে তাঁর সে নিজস্বতা থেকে যেত। তবে? বন্ধু মনোনয়ন থেকে তাঁর চরিত্র চেনা যেত না। আমরা স্বভাবানুযায়ী বা সুবিধানুযায়ী বন্ধু মনোনয়ন করি, তার সঙ্গ যাচ্ঞা করি। বিভূতিবাবু নির্বিকারে প্রত্যেকের সঙ্গে মিশে যেতেন। আমার সঙ্গে তাঁর কথায় তাঁকে যেমন লাগত, অন্যের সঙ্গে কথায় তাঁকে সম্পূর্ণ ভিন্ন মনে হ'ত! তাই কখনও বা অন্ধের হস্তী দর্শনের ভুল হওয়া বিচিত্র ছিল না। সাহচর্যের ক্ষণ-মুহূর্ত্তগুলিতে তাঁকে সম্যক ধরা যেত না।

বিভিন্ন উপাদানেও চরিত্রে তাঁর এসেছিল বৈচিত্র্য। সহজতার অন্তরালে ছিল মনীষা? অধিকাংশ শিল্পীর মতই বিভূতিভূষণ কিয়ৎ পরিমাণে অভিনেতা ছিলেন। চতুর্থত, তাঁকে চেনার পক্ষে ভুল ছিল এই।

তীক্ষ্ণলক্ষ্য নিপুণ ঔপন্যাসিক যিনি, মানুষ-চরিত্রের তুচ্ছ দুর্বলতা যাঁর অভ্রান্ত দৃষ্টি অতিক্রম করত না, তিনিই আবার শিশুর মত

সহজ? শিশু এবং প্রাজ্ঞ কি একাধারেই ছিল? বিভূতিভূষণের বন্ধু পরিমল গোস্বামীর মত তাই। অনেক খ্যাতনামা সমালোচক বলে গেছেন স্রষ্টা স্বয়ং ছিলেন অপু।

কিন্তু, অপুর ঘটেছিল আত্মদর্শন। 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিতের' ছত্রে ছত্রে সেই আশ্চর্য আত্মদর্শনের ছাপ। সময়ে তা নৈর্ব্যক্তিকতার পর্যায়ে পর্যন্ত উঠেছে। নিষ্ঠুর দূরত্ব, যা কেবল শিল্পীর নির্লিপ্ত বীক্ষণে সম্ভব, তাই তো দেখি বিভূতি বাবুর রচনায়। তাহলে, এলোমেলো, হ্যালাক্ষ্যাপা লোকটি এলেন কোথা থেকে? নিজের দোষত্রুটি প্রতি মুহূর্তেই তাঁর চক্ষে ধরা পড়ছে। 'অপুর স্বপ্ন' তাঁর চোখকে সম্পূর্ণ আবরিত করে রাখেনি।

সেই ব্যক্তি প্রকৃত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে হয়। তাঁর অভিনেতা সুলভ হাল্কা সহজতার অন্তরালে দেখা যেত অসামান্য প্রতিভাধর প্রকৃত স্রষ্টাকে, তাঁর সৃষ্টির উপাদান— চারপাশের জগৎ। সামান্য তৃণাঙ্কুরটি পর্যন্ত তাঁর খাতার হিসাব না মিটিয়ে ফাঁকি দিতে পারেনি।

নিরহঙ্কার লোকটির অহঙ্কার (গর্ব নয়) ছিল এতই প্রচুর যে তাঁর বাইরের বড় কথায় প্রয়োজন ছিল না। পাঠক তাঁর লেখার নিন্দা করলেও ক্ষতি ছিল না। তিনি নিশ্চিত করে জানতেন 'পথের পাঁচালী' যে কোন ভাষায় একখানি মাত্র লেখা হয়। বিভূতিভূষণের প্রতিভা যাঁর থাকে, কেবলমাত্র তিনিই সাহস করতে পারেন সমগ্র নাগরিক জগতকে প্রেম, ঈর্ষা, পাপপুণ্যের জটিলতা থেকে আহ্বান করে নিতে অখ্যাত পল্লীসীমায় দরিদ্রঘরের ছেলেমেয়ের বৈচিত্র্যহীন কাহিনীর তুচ্ছ পরিমণ্ডলে। বৈচিত্র্যহীন তাই বিচিত্র। সহজ তাই তো জটিলতা। সাধারণ বলেই অসাধারণ।

প্রকৃতিকে বিভূতিবাবু ভাল বাসতেন পাগলের মত। বনে পাহাড়ে ভ্রমণ ছিল তাঁর ব্যসন। কিন্তু নির্জনতা কামনা করতেন না। অনেক লোকের মধ্যেও তিনি একই আনন্দ পেতেন। ধনীর আড়ম্বরপূর্ণ জীবন তাঁর অনুকম্পার খোরাক যোগালেও বড় লোকের চা-এর সভায় আনন্দ তাঁর কম দেখিনি। নিজে অত্যন্ত সহজ ও সাদা জীবন যাপন করে যেতেন, কিন্তু বিলাসে যে ঐশ্বর্য, তিনি তা ভাল বাসতেন।

এক একটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ববিকাশ এক এক পথ ধরে হয়। আত্মস্ফুরণ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র। সহজতা বিভূতিভূষণের ছিল নিজেকে বিকাশের পথ। কথায়, ব্যবহারে, বেশে, এই সহজতার অনুশীলন তাঁর রচনাকে অত সহজ করেছিল। অনাড়ম্বরতা ও সহজতাই তাঁর আর্ট। যদি তিনি আড়ম্বর-পূর্ণ জীবন যাপন করতেন, তা'হলে হয়তো তাঁর রচনার অমন সহজতা নষ্ট হয়ে যেত।

বিভূতিভূষণের সাহিত্য সমালোচনা আমার উদ্দেশ নয়। তবু সাহিত্যের কথা যখন এসে পড়েছে, একটা কথা বলে নেব। বিভূতিবাবুর অধুনাতম রচনাগুলি অনেক আধুনিক পাঠককে তৃপ্ত করত না। অনেককে বলতে শুনেছি, ওঁর প্রতিভা শেষ হয়ে গেছে।

সত্যই, বিভূতিভূষণের কোন কোন রচনাতে একটা অবসাদের ছাপ দেখা যেত। সেটা অবসাদ মাত্র, প্রতিভার অবসান নয়। বর্তমানে নূতন লেখকেরা পর্যন্ত অবসাদগ্রস্ত, যুগের লক্ষণ তাই। যিনি অল্প সময়ে অসংখ্য পুস্তক (দীর্ঘ) লিখে গেলেন, তাঁর এই অবসাদ স্বাভাবিক অবশ্যই। জীবনযাত্রার নূতন কোন বৈচিত্র্য, মানসিক অনুশীলন, অথবা অনুপ্রেরণার উন্মাদনা আবার তাঁর মধ্যে প্রতিভাকে নব রূপে উজ্জীবিত করত। স্বাস্থ্য ও জীবন উৎসাহ

যাঁর অত বেশী ছিল, তাঁর প্রতিভার অবসান অত কম বয়সে ঘটে না। আমরা প্রতিভা দেখতে এতই অনভ্যস্ত যে, মুরুব্বী প্রথায় মুহুর্মুহু প্রতিভার অবসানের ভবিষ্যদ্‌বাণী করে যাই।

দাসত্ব দাসমনোভাবের জন্ম দেয়। বাঁধাধরা ছকে কাউকে ফেলতে না পারলেই আমরা তাকে বাতিল করে দিতে চাই। নিজেদের অক্ষমতা বা অজ্ঞতা স্বীকার করি না। বিভূতিবাবুর আবার ব্যবহারে কোন অসামান্যতা ছিল না। তাঁর প্রতিভার কোন বহিঃপ্রকাশ দেখা যেত না। অথচ আমরা রাবীন্দ্রিক ঐতিহ্যে অভ্যস্ত—যাঁর বহিঃপ্রকাশে অসামান্যতা দেখিনা, তাঁকেই অস্বীকার করতে চাই। এই অতি সাধারণ মানুষটি কি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, অনেকে বুঝেও তাই হয়তো বুঝতে পারতেন না।

মেয়েদের দিক থেকে বিভূতিভূষণের সম্পর্কে একটি প্রকাণ্ড বলবার কথা আছে। রোমান্টিক প্রেমের পরিপোষকতা তাঁর রচনায় দেখতাম না। প্রেমের তীব্র উন্মাদনা, অনির্বাণ আকাঙ্খা, ঈর্ষার বেদনা ও কামনার দাহ তিনি জীবনে একান্তভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কি না জানি না। তাঁর জীবনের সামান্য দুই-একটি প্রেমের আখ্যান জানি। সেখানেও তিনি সহজ। তিনি স্নেহকেই বুঝতেন বেশী নিঃসন্দেহে। তাঁর প্রেমিকা নারী সর্বদাই সেবিকা। প্রিয়া ও জননী তাঁর চোখে বিভিন্ন ক্ষেত্রচারিণী নয়।

প্রকৃতপক্ষে তাঁর মনে ছিল অপূর্ব শুচিতা। শুচিতাবোধ নারীকেও তাঁর চক্ষে শুচিশুভ্র করে রেখেছিল। কোন নারীর অধঃপতনের কাহিনী তিনি অঙ্কিত করতে পারেননি। 'কেদার রাজার' পতিতালয়ের চিত্রে তাই দেখি তাঁর অনুৎসাহ অপটুতা। 'অথৈ জল' তাই ব্যর্থ রচনা।

প্রাত্যহিক জীবনে নারীর সম্পর্কে এই মর্যাদা তিনি দিয়ে গেছেন সহজাত শুচিতাবোধে। সাহিত্যিক, পণ্ডিত, অভিজাত কাউকেই

আধুনিকাদের বিষয়ে অসংযত উক্তি বর্ষণে বিরত দেখিনি। কিন্তু, দীর্ঘ ও নিবিড় আলাপের মধ্যে কোনদিন বিভূতিবাবুর মুখে কোন মহিলা সম্বন্ধে অভদ্র উক্তি শুনিনি। ভদ্রলোকের এখানেই সর্বোত্তম পরিচয়। অতি সাধারণ, পল্লীগ্রামবাসী মানুষটি এদিকে অনেক অভিজাত নাগরিক অপেক্ষা শ্রেয় ছিলেন। He was a perfect gentleman. তিনি ছিলেন জন্ম-গ্যালান্ট। পুরুষের এব অপেক্ষা কোন যোগ্যতর প্রশংসা কোন মহিলা জানেন না।

বিভূতিভূষণের বিষয়ে একটি বিশেষ কথা বলতেই লিখতে বসেছি। আমার ইচ্ছা ছিল সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের বিষয়ে 'portrait' ও 'profile' জাতীয় রচনা লিখি। বিভূতিবাবু একটি বিশেষ টাইপ, তাই তাঁর বিষয়েও লিখব ইচ্ছা ছিল।

বিভূতিবাবু আমার ইচ্ছার কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হ'লেন। অতি অল্পেই তিনি খুসী হ'তেন। তিনি সাগ্রহে বললেন—"আমাব বিষয়ে যখন লিখবেন, তখন সবাইকে বলে দেবেন আমাব কোন অতৃপ্তি নেই। সব ইচ্ছাই আমাব পূর্ণ হয়েছে। বেডাবাব ইচ্ছা ছিল, তা খুব বেডিযে নিযেছি। খাবাব আকাঙ্খা ছিল ভালমন্দ—ওঃ, খুব খেয়েছি! নাঃ, আমার আর আকাঙ্খা নেই। আরও যা ছিল সাধ, পূর্ণ হযেছে।"

চলে যাবার সময়ে সেদিন বিভূতিবাবু আবাব এই কথাই বলে গেলেন। দিনক্ষণ মনে নেই, প্রায় ছুবছর আগেব কথা। আশ্চর্যের বিষয়, সন্ধ্যাবেলা কি সকাল তাও ভুলেছি, কিন্তু, অতি স্পষ্ট করে ছবির মত মনে আছে—সার্দান অ্যাভেনিউব বাস্তাব উপবে চলে যেতে যেতে হাত তুলে 'পথের পাঁচালীর' বচযিতা আমাব মত একজন সামান্য ব্যক্তিকে বলে যাচ্ছেন:

"তা'হলে, মনে থাকে যেন, আমাব কথা যখন লিখবেন, লিখবেন আমার কোন আকাঙ্খাই অপূর্ণ নেই। আমি জীবনে তৃপ্ত হযেছি।"

কয়জন অমন করে বলতে পারে?

অনুরূপা দেবী

অনুরূপা দেবীর নামের পূর্বে সর্বদা একটি বিশেষণ দেখেছি, 'সাহিত্য সাম্রাজ্ঞী'। প্রথম যেদিন দূর থেকে দেখেছিলাম, তাঁর ঋজু দেহে দেখেছিলাম নামের সার্থকতা। গাম্ভীর্য ও আত্মমর্যাদার সীমারেখায় জনতার মধ্যে ব্যক্তিত্বকে সংহত করে রাখবার চেষ্টা দেখেছিলাম। অধরের প্রান্তে ঈষৎ আত্মাভিমান দেখে ফিরে এসেছিলাম।

তারপর তাঁর রচনা আলোচনা সম্পর্কে লেখালেখির মধ্য দিয়ে পরিচিত হ'লাম।

অবশেষে সাক্ষাৎ হ'ল সমতল ভূমিতে। আসানসোল 'রবীন্দ্র শরণীর' উদ্যোগে সাহিত্য সম্মেলনে নিমন্ত্রিত বক্তা হয়ে অনুরূপা দেবীকে পেলাম ১৯৫৪ সালে। বড়দিনের আসানসোলে। অনুরূপা দেবী সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন।

সেই লালপাড় শাড়ী, প্রায় ভগ্ন কিন্তু ঋজু দেহ।

আসানসোলের শীতার্ত কিন্তু মধুর যীশুর জন্মদিনে একই মঞ্চে তাঁর পাশে বসবার অধিকার পেলাম। 'মহিলা কল্যাণ বিদ্যালয়ে'এর প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ পড়েছিল। সকালের উৎসবে দেখা হ'ল। অনুরূপা দেবী তখন রাণীগঞ্জে ছিলেন। একটি সুসজ্জিতা ও সালঙ্কারা নাতবৌ সহ তিনি আসানসোলে সাহিত্যসম্মেলন উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। তাঁর পক্ষে অন্যান্য দিনে বা সন্ধ্যার উৎসবে যোগদান সম্ভব হ'বে না।

সভার কিঞ্চিৎ বিলম্ব ছিল। আমাদের একটি ঘরে বসানো হ'ল। স্বীকার করছি সভয়ে এবং অনিচ্ছায় অনুরূপাসকাশে গেলাম। পূর্ব্বসূরী মহিলাদের কাছে কখনও স্নেহ পাইনি। রক্ষণশীল মহলে স্বীকৃতির স্বাক্ষর দেখানো শক্ত। ইতিপূর্বে কোন পত্রিকায় সাহিত্য-সাম্রাজ্ঞীর সঙ্গে লিখিত মতানৈক্য হয়েছে। শুনেছি অনুরূপা দেবী অসুস্থ, অসুখী। তাঁর প্রৌঢ়ত্ব, তাঁর শোকের কাছে পরাজিত হয়ে দূরে সরে ছিলাম।

তাঁর হাতে কাপড়ের একটি বটুয়া ছিল। সেইটির প্রসঙ্গ ধরে অনুরূপা দেবী নববিবাহিতা নাতবৌর সঙ্গে পরিহাস করলেন। নাতির উল্লেখ করে, সহাস্য রসিকতা করতে লাগলেন মধ্যে মধ্যে। একমুহূর্ত্তে গুরুগম্ভীর লেখিকা আমার মনে সহজ মানুষ রূপে দেখা দিলেন।

দেখলাম শোক বা রোগ সাহিত্যিক মনের সহজাত রসবোধকে মলিন করতে পারেনি। যে আনন্দরস স্রষ্টার উপজীব্য, সেই রসধারা লেখিকার মনে আজও বহমান। সাহিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ, সাহিত্যিকের মনে যে পুলক বৃষ্টি হয়, যে তারুণ্য চিরকাল বাস করে, তার জন্য বাইরের কোন উপাদানের প্রয়োজন হয় না। অনুরূপা দেবীর প্রকৃত লেখক-সত্তা আসানসোলের সুনীল, পরিষ্কার আকাশের নীচে আমার চোখে সেদিন প্রতিভাস হল। অনুরূপাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম।

সভাক্ষেত্রে অনুরূপা দেবী ভাষণ দিলেন। সহজ, সরল বক্তৃতা। বিন্দুমাত্র প্রয়াসের চিহ্ন নেই। সাহিত্যসাম্রাজ্ঞী জনতার অভিনন্দনে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ বলে গেলেন। তিনি হাসিমুখে আরম্ভ করলেন, সাধারণতঃ আমাকে সভানেত্রীত্ব করতেই নিয়ে যান সকলে, উদ্বোধন আমি করি না। সুতরাং আমি অভ্যস্ত নই।

তাঁর ভাষণ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী। বক্তা হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব প্রচুর।

একদিন মনে হয়েছিল, এত অধিক সংখ্যক দীর্ঘ পুস্তক প্রণয়নে না জানি অনুরূপা দেবীকে কতই না পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত সময় দিতে হয়েছে জীবনের পাত্র থেকে ছিনিয়ে নিয়ে! এখন মনে হ'ল, তাঁর পক্ষে সাহিত্যরচনাও অনায়াসলব্ধ সম্পদ ছিল, সাহিত্যসাম্রাজ্ঞীর আসন পাবার জন্য শ্রমকর প্রস্তুতি তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়নি।

বাড়ীতে যাবার আমন্ত্রণ ছিল। আমাদের অভ্যর্থনার ভার রাণীগঞ্জনিবাসিনী তরু ঘোষের হাতে। আসানসোলে দুইদিন ব্যাপি 'রবীন্দ্র শরণীর' সম্মেলনের পর তিনি আমাকে রাণীগঞ্জে নিয়ে গেলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় অনুরূপা-ভবনে আমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু রাণীগঞ্জে পৌঁছলাম সন্ধ্যার পরে।

পরদিন সকালে কয়লাখনি দেখার শেষে অনুরূপা দেবীর বাড়ী গেলাম। অজস্র পুষ্পশোভিত বাংলো বাড়ী রোজ লজ। তিনি দুঃখ করলেন, "কাল তোমার জন্য কত কি খাবার তৈরী করে বসে রইলাম, তুমি এলে না।"

তখনি আমাকে চলে আসতে হ'বে, কিন্তু সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর যত্ন, তাঁর খাওয়ানো মনে রাখার বিষয়। গল্পে, হাসিতে চমৎকার সামাজিক মানুষটি যে এত বড় মণীষার অধিকারিণী, ভাবতে বিস্ময় বোধ হচ্ছিল।

কত কথা হ'ল মনে নেই। কারণ, গাঁদা-গোলাপ গাছের দিকে চেয়ে বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। লালপাড় সাড়ীর আঁচল মাথায়, বেতের মোড়ায় বসে যিনি গল্প করছেন, তিনি সেই অনুরূপা দেবী, আমাদের শৈশব-বিস্ময়। একমঞ্চে এক পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে বক্তৃতা

করবার ও বসবার অধিকার আমি পেয়েছি। এতবড় বিস্ময় কি করে সংঘটিত হ'ল ?

তিনি আতিথ্যপরায়ণা, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী। তাঁর ধীশক্তি পুরুষসুলভ, অথচ তিনি মনে মনে কবি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আদরিণী পৌত্রী—জীবনে প্রতিভার সমাদর পেতে পেতে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ। কিন্তু তিনি নিজেও প্রতিভার সমাদর দিতে জানেন।

জীবন তাঁকে ব্যক্তিগত বহু শোক দিয়েছে, ব্যবহারিক ক্ষয়ক্ষতি অনেক সহ্য করিয়েছে। সেই সমস্ত গোপন বেদনার পীড়নে কখনও অসহিষ্ণু বা বিক্ষিপ্ত হ'লেও তিনি প্রকৃত পক্ষে মহৎ। বাল্য থেকে তাঁকে মহত্ব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তাঁর রচনা মহৎ, তিনি মহিয়সী।

তাঁর কাছে আশ্রয় মেলে। সাধারণ নারীর মত তিনি গৃহস্থালি-সর্বস্ব নন, উদাসীন নিরাসক্তি তাঁর চরিত্রে প্রবল। কিন্তু তিনি স্নেহশীল। বিদায়ের সময় প্রণাম করতে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আন্তরিক স্নেহে বললেন, "তুমি আবার এসে আমার কাছে থেক। আমি রইলুম। যখনি ইচ্ছা হ'বে দিদির কাছে চলে এস।"

সেই মুহূর্তে আমি তাঁর সঙ্গে একাত্মা অনুভব করলাম।

বারান্দার নীচে অসংখ্য ফুলের গাছ। পুষ্পসুরভিত প্রহরে রাণীগঞ্জের কয়লার খাদে আমি একখণ্ড হীরক কুড়িয়ে পেলাম।

এখন সাহিত্যসাম্রাজ্ঞীর সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলি। অনুরূপা দেবী বাংলা ভাষায় লেখিকাদের মুকুটমণি। অনুরূপা দেবীর উপন্যাস মনে দাগ রেখে যায়। কোন রচনাকারের বিষয়ে এর চেয়ে বড় প্রশংসা-বাণী আমার জানা নেই।

সাহিত্য বিচারে আমাদের মতামত সহজেই ভ্রান্তিবাহক। আপাত খ্যাতির বাজারে যাঁর লেন-দেন সর্বোত্তম, ভবিষ্যতের হাটে তিনি হয়তো দেউলিয়া। বর্তমান যাঁকে পথের ধারে সরিয়ে রেখেছে, অন্য যুগ তাঁকেই রথের দেবতা করবে। তুলনামূলক সমালোচনা করলে তবেই বোঝা যায় ভিন্ন ভাষার সাহিত্যে স্থিতিশীল হ'বার যা যা লক্ষণ, সেগুলি আলোচ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতদূর প্রযুজ্য। হাল্কা কথার ফুলঝুড়ি অপেক্ষা গভীরতাধর্মী রচনা চিরকালই অধিক আদৃত। আঙ্গিকের অভিনবত্ব অপেক্ষা তথ্যকেই আমরা প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। ভাষান্তরের অগ্নিপরীক্ষায় যে গ্রন্থ রসোত্তীর্ণ, সুধীব্যক্তি তেমন গ্রন্থকেই শাশ্বত সাহিত্য বলবেন।

গভীরতাধর্মী রচনা অনুরূপা দেবীর। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি কবির ললিত মধুর কটাক্ষ নয়, দার্শনিকের গুরুগম্ভীর পর্যবেক্ষণ। গুরুত্বে কখনও পল্লবগ্রাহী যুগের কাছে তিনি অসহনীয়, কখনও পাণ্ডিত্যে নীরস, কিন্তু সার্বজনীন সত্যের উদ্দেশে তিনি সর্বদা উন্মুখ। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা অনেক কিছু হারানো সত্য খুঁজে পাই। আমরা আবার এমন একটি জগৎ পাই, যেখানে ঈশ্বর কল্পনামাত্র নন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য; যেখানে আদর্শ আছে। ব্যক্তিগত প্রেয়কে বহুর জন্য শ্রেয়র মধ্যে বিসর্জনকারী যে বিজয়ী মনুষ্যসত্তা, সমগ্র জীবন অনুরূপা দেবী তারই উপাসনা করে গেছেন। অনুরূপা দেবীর রচনাবলী মহত্বের সাধক।

লেখিকা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগমন করেছেন হিন্দুশাস্ত্ররচয়িতার পথে পথে। আমরা তাঁর অবদানের প্রধান মূল্য সেখানেই দেব। তাঁর নিজস্ব অবদান ওখানেই। তারাশঙ্করকে অনুন্নত সম্প্রদায়ের সৃজন হেতু যে অভিনন্দন জানাই, কয়লাখনির সৃজন জন্য শৈলজানন্দকে যে সাধুবাদ দিই, গ্রাম্যকথার কাহিনীকার হিসাবে যে সম্মান মানিক

বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাপ্য, অনুরূপ প্রশংসার অধিকারিণী অনুরূপা। একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন। হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধের সঙ্গে লেখিকার সৃষ্ট মানুষগুলি একসূত্রে গ্রথিত। তাঁর নায়ক-নায়িকা এমন আকাশের নিচে বাস করে, যেখানে ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন স্বতঃস্ফূর্ত। অবাস্তব বলা চলে না। কারণ তাঁর সৃষ্ট নায়িকার সঙ্গে কখনও অভেদাত্মা হয়েছি, মনে হয়েছে : এরা আমাদের মধ্যে এখনও হারিয়ে যায়নি। ভারতবর্ষকে বিদেশীর চোখে চেনাবার জন্য যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রয়োজনীয়, তেমনি অনুরূপা দেবীর কোন একখানি উপন্যাসের ভাষান্তর হওয়া উচিত, ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দুনারীর সম্যক পরিচয়ের জন্য। মারি করেলির সঙ্গে তুলনা করা অনুরূপা দেবীর রচনার অপমান বলেই আমি মনে করি। তাঁর পথ গার্গীর যুগে আরম্ভ হয়েছে।

যে সকল সুকঠোর অনুশাসন আজ উদার হিন্দুধর্মের প্রাণবারিধি সীমায়িত করে প্রতি মুহূর্তে এই ধর্মকে ক্ষয় করে আনছে, অনুরূপা-সাহিত্যে তাদের রূপান্তর ঘটেছে রস সংযোগে। যথা :-

"তপস্যার কঠোরতার জন্যই নিজের চারিদিকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করাতে যোগীর যে সুখ, নিয়মচারিণী ব্রহ্মচর্যশীলা হিন্দু বিধবা তাঁহার পরলোকগত প্রিয়তমের স্মৃতির সম্ভ্রমে নিদাঘের অগ্নিতপ্ত রজনীতে একাদশীর দুরন্ত তৃষ্ণাকে যেমন পরমসুখের মত অনায়াসে সহ্য করিয়া যান, সে-ও সেই রকমই একটি দুর্জ্জেয় আধিদৈবিক শক্তি দিয়া নিজের আশাহত চিত্তের তীব্র ক্রন্দনকে বলিদানের বাদ্য বাজাইয়া ঢাকা দিতে চাহিতেছিল।....তাহা আইনের ধারা নহে, যোগ্যতার পুরস্কার। আমি যে জিনিষের যোগ্য নই, লোভ করিয়াই কি তাহা লাভ করিতে পারিব?"

অনুরূপা দেবী সার্থক কাহিনীকার। তাঁর পুস্তকের পুনঃপৌনিক মঞ্চসাফল্য দেখে সহজেই বোঝা যায়। সার্থক ঔপন্যাসিকের প্রধান দুইটি গুণ তাঁর রচনায় বিদ্যমান, কৌতূহল বা suspense প্লটসৃষ্টির কৌশলে আদ্যন্ত বজায় রাখা এবং খুঁটিনাটি বা detail পরীক্ষা। অবশ্য গ্রন্থকারের প্রত্যেকটি গ্রন্থ একই মানের হয় না।
বর্তমান যুগ তাঁকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দিতে ভুলে যায়নি। তাব প্রমাণ তাঁব রচনার অবিশ্রাম মুদ্রন।
সত্যই রচনাকারেব গৌবব ওইখানেই নিহিত থাকে। প্রকাশক বলেছেন: অনুরূপা দেবীব 'মা' উপন্যাসখানির মত বিক্রয় দুর্লভ। হয়তো লেখিকার অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয়, কিন্তু 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', প্রভৃতি উপন্যাস বহুলপঠিত। তিনি কয়েকখানি ক্ষুদ্র নাটিকা ও ছোট কবিতা লিখেছেন। গল্পও তাঁব যথেষ্ট আছে। ইদানীং বড় লেখা বন্ধ করাব পবে মাঝে মাঝে ছোট গল্প তিনি লিখেছেন। অধিকাংশ 'গল্প-ভারতী' পত্রিকায় আমি পড়েছি। প্রকৃতপক্ষে অনুরূপা দেবীর কয়েকটি উপন্যাস, (হাতে না-পাওয়া হেতু) ভিন্ন প্রায় সমস্ত রচনা আমি পড়েছি সংগ্রহ করে অথবা ক্রয় করে। 'গবীবের মেয়ে', 'চক্র', 'হারানো খাতা', 'পথের সাথী', 'সর্বাণী', 'বিবর্তন', 'উত্তরায়ণ', 'পথহারা', 'দ্বিপত্নীক' ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে প্রথম তিনটি গ্রন্থাবলীতে; 'পথের সাথী' ও 'বিবর্তন' পুরাতন বসুমতীতে; 'পথহারা' 'উত্তরায়ণ', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা' ও 'মা' পুরাতন ভারতবর্ষে পড়েছি। 'সর্বাণী', বিচিত্রার পুবাতন কপিতে শেষ পাইনি, 'বাগদত্তা' ভারতীতে, 'দ্বিপত্নীক' সুপ্রভাতে শেষ পাইনি। পরে 'জ্যোতিঃহারা' নামে 'দ্বিপত্নীক' পেয়েছি। ছোট গল্পের মধ্যে 'ফুলের তোড়া' (বোধহয় 'বঙ্গমহিলায়' প্রকাশিত), 'ধূমকেতু' (ভারতবর্ষে) বেশ ভাল লেগেছিল। বলাবাহুল্য, প্রায়

সবগুলিই আমি একাধিকবার পড়েছি। অতি পুরাতন একখণ্ড মাসিক বসুমতীতে 'গরীবের মেয়ের' আরম্ভ পড়ে কৌতূহলী ছিলাম। অতি পুরাতন, (বোধহয় ১৩৩০ সালের), 'বঙ্গবাণী' আমার হাতে পড়েছিল, তাতে 'হারানো খাতার' এই অংশটুকু ছিল :—
"নরেশচন্দ্রকে বিমনা ও ব্যথিত করিয়াছিল সুষমার এই চিঠিখানি"— তারপরে পত্রে, সুষমার কাপড়ের বাক্সের বর্ণনা ইত্যাদি ছিল। এই অংশ পড়ে সুষমা ও নরেশচন্দ্র কে, ও তাঁদের সম্পর্ক কি, জানবার বাসনা হয়। পরে বইগুলি ক্রয় করে পড়েছিলাম।

এইখানে একটি কথা আমি বিশেষ ভাবে বলতে চাই; অনুরূপা দেবীর লেখা উল্লেখের জন্য আমাকে কোন বই দেখতে হচ্ছে না। এ কথা আমার স্মৃতিশক্তি প্রশংসার জন্য অবশ্যই আমি উল্লেখ করছি না। উল্লেখ করছি শুধু জানাতে যে, একজন আধুনিকীও তাঁর রচনা কি ভাবে পাঠ করেছে। বিপুল ও বিচিত্র বিদেশী পুস্তকের জগৎ যাদের কাছে অবারিত, তারাও তাঁর রচনায় শ্রদ্ধাশীল আছে, এবং বিশদ ভাবে গ্রহণ করেছে—এ কথা যে কোন লেখকের পক্ষে একটা বড় পাওনা। সভা ভঙ্গ হয়ে যায়, শুষ্ক ফুলের মালাকে বিসর্জন দিতে হয় পথের ধুলায়, কিন্তু স্রষ্টার সম্মান তো সেখানে থাকে না।

অনুরূপা দেবী পূর্ব যুগের লেখিকা। আমাদের জন্মের পূর্বেই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহ প্রকাশিত হয়। তাঁর সাহিত্যের স্বর্ণযুগের কথা আমরা শুনেছি: যখন প্রত্যেকটি অভিজাত পত্রিকায় এক সঙ্গে তাঁর অনেক উপন্যাস প্রকাশিত হ'ত; প্রকাশক ও সম্পাদকের তাড়নায়, সভা-সমিতির সভানেত্রীত্বের উৎপাতে তিনি সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্র তাঁর উপন্যাসের জন্য লালায়িত ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী, বিশিষ্ট পরিবারের বধূ, ঠাকুর পরিবারের সখী, স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও সাহিত্য-পত্রের আত্মীয়া

অনুরূপা দেবী স্বীয় প্রতিভা ও যশে নাগরিক-সমাজের যে স্থানটি অধিকার করেছিলেন, তা সাধারণ সাহিত্যিকার স্বপ্নের অগোচর। তিনি আগে জায়া এবং মাতা হয়ে তবেই লেখিকা হয়েছিলেন। সাহিত্যসাধনার জন্য তাঁকে কোন মূল্য দিতে হয়েছিল কি না জানি না, তবে অন্ততঃ আমাদের মত অসম্মান ও অবিচার সহ্য করতে হয় নি, একথা জানি। বাংলা দেশ তাঁকে যতটা সম্মান দিয়েছে, ততটা সম্মান ভবিষ্যতে কোন ঔপন্যাসিকাকে দিতে পারবে কি না সন্দেহ। 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনেব' সভানেত্রী করে, তাঁর নামে স্কুল খুলে, আরও বিভিন্ন প্রকারে দেশবাসী তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছে। অদ্যাপি রঙ্গমঞ্চে ও ছায়াচিত্রে তাঁর বিজয়।

বিগত এই সুবর্ণ যুগের পরে হয়তো বর্তমান তাঁর কাছে বিবর্ণ মনে হবে। কিন্তু, এই স্বাভাবিক। যে রচনাকারের সৃষ্টিকাল অবসিত, তাঁকে সময়ের পদক্ষেপ পাশে সরিয়ে রাখে। হয়তো অশ্রদ্ধায় নয়, কুলুঙ্গিতে তুলে-রাখা বিগ্রহের মত সুদূর সম্মানে। সকলকেই এ দিন সহ্য করতে হয়, যদি না তাঁব যুগলক্ষণকে স্বীকাব করবাব প্রতিভা থাকে।

অনুরূপা দেবী সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ও বিদুষী বলে শুনেছি। দুই একটি প্রবন্ধে তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। পূর্বেই বলেছি তাঁব রচনার প্রতিপাদ্য হিন্দুধর্মসঙ্গত। আদর্শবাদী ও ত্যাগমূলক ঐতিহ্যে, গুরুগম্ভীব ভাষায় দীর্ঘ উপন্যাস তিনি প্রণয়ন করেছেন। 'মন্ত্রশক্তি', 'মা' পড়ে কেঁদেছি আমরা। ভাষার ঝঙ্কারে ও ঘটনাবিন্যাসের কৌশলে যে কোন সার্থক বিদেশী উপন্যাসের সমকক্ষ তাঁর রচনা। তাঁর পুস্তকে আমার বিশেষ ভাল লাগত চরিত্র বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীতে চরিত্র ও ঘটনার মর্মস্থল উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য উপন্যাসের লিখন-

ভঙ্গির দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন। মনের সম্পূর্ণ হিন্দুভাব সত্ত্বেও তাঁর মনের দ্বার যে তিনি বন্ধ করে বসেননি, পশ্চিমের নব্য হাওয়া সেখানে প্রবেশ করেছিল তার প্রমাণ, লেখিকার দুই একটি উপন্যাস ও গল্পের আখ্যান-ভাগ বিদেশী-উৎসের সাক্ষ্য দেয়। ভাষার গঠনেও সেই বিদেশী প্রভাব বারবার পরিলক্ষিত হয়। সে-যুগে অনুরূপা দেবীর এই নব্য-ভাবের প্রতি সমালোচকের মনোভাব কৌতুকজনক :—"দ্বিপত্নীক' শ্রীঅনুরূপা দেবীর ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প। লেখিকা গল্পে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের চিত্র আঁকিতেছেন। তাই বুঝি ভাষাটিকেও চমৎকার ইঙ্গ-বঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। মা সরস্বতী গাউন পড়িয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।"—(সাহিত্য —বৈশাখ, ১৩১৯—সুরেশচন্দ্র সমাজপতি)

আমরা অনুরূপা দেবীর এই, তৎ-কালীন সমাজের পক্ষে অতি আধুনিক ও নব্য ষ্টাইলের সমর্থনে সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে. লেখিকা তাঁর যুগে যথেষ্ট প্রগতিশীলা ছিলেন। যদি তিনি অজস্র রচনার দ্বারা বর্তমান যুগের জন্য ভূমি প্রস্তুত করে না যেতেন, তাহ'লে আমাদের আবার ওই 'মা' ও 'মন্ত্রশক্তি' থেকেই আরম্ভ করতে হ'ত। তাই আমরা, বর্তমানের লেখিকারা, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

অবৈধ প্রেমের চিত্র অনুরূপা দেবী আঁকেন নি, কিন্তু অধিকাংশ পুস্তকের উপজীব্য তাঁর প্রেম। বিশুদ্ধ ও বৈধ প্রেম। বিরাট পটভূমিকা সৃষ্টি করার জন্য প্রেম-কাহিনীতে কখনও অন্য গল্পও যুক্ত হয়েছে, যথা, 'পথহারা', 'চক্র' ইত্যাদি। শুধু একজোড়া নয়, অনেক জোড়া নায়ক-নায়িকা ও তাদের প্রেম, বিরহ ইত্যাদির চিত্র অজস্র পাওয়া যায়। দুইএর প্রতি একজনের প্রেম, একজনের প্রতি দুইএর প্রেম, বিবাহ, জাতিভেদ, কুল ইত্যাদির হেতু বিচ্ছেদ, এই রকম বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে অনুরূপা দেবী সমাজের ও প্রেমের চিত্র

এঁকেছেন। পূর্বরাগ তাঁর উপন্যাসে প্রচুর। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের বৈধ দৈহিক মিলন সম্পর্কে তিনি নীরব নন। প্রেমের জন্য বিরাট ত্যাগ, একনিষ্ঠ ভালবাসা—সব চিত্রই অনুরূপা দেবীর রচনার রোমান্টিক প্রবণতা দেখিয়ে দেয়। তাঁর যুগের সমস্যা তাঁর রচনায় আছে, কখনও বা বিকৃত জীবনের ঈষৎ পরিচয় আছে, কখনও বাস্তবে সত্যনিষ্ঠা আছে। সুতরাং তাঁকে ভীরুতার অপবাদ দেওয়া অসম্ভব। 'মন্ত্রশক্তির' মৃগাঙ্কের দিন-যাপন, 'হারানো খাতায়' সুষমার কলঙ্কিত জন্ম, বিভিন্ন উপন্যাসে কথোপকথনে একান্ত বাস্তব-ধর্মী ভাষা, প্রেমার্ত-নরনারীর ব্যবহার ইত্যাদি থেকে আমরা যেমন দেখি, সে মন নিজেকে যে দেশাচারসুলভ স্ত্রীজনোচিত সংস্কারে আবদ্ধ রেখেছে, একথা কোনক্রমেই বলা যায় না। প্রকৃত লেখকের রক্ত ও উচ্চদরের ঔপন্যাসিকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ রচনায় যেখানে যতটুকু দরকার, তা থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারেনি। অথচ প্রবন্ধমালায় যে নিষ্ঠাপরায়ণা হিন্দুরমণীর সাক্ষাৎ পাই—প্রত্যেকটি উপন্যাসের সমাপ্তি যে তাঁরই হাতে তুলে দিয়ে আমাদের শিল্পী সরে দাঁড়িয়েছেন ও তাঁর সর্বগ্রাসী দৃষ্টি মুদিত করে ফেলেছেন! তাই উপন্যাসের গতি ও প্রকৃতি অনিবার্যরূপে একটি আদর্শবাদে হোঁচট খেয়ে হঠাৎ পঙ্গুত্ব লাভ করে। স্থান বিশেষে অধঃপতন যত সহজে তাঁর কলমে ফোটে, অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী পবিত্রতা ততটা সাবলীল নয়। মৃগাঙ্ক অধঃপতিত যতক্ষণ, ততক্ষণ যেন মনে হয় একটি জীবন্ত মানুষ। জেদী, মুখরা, দাম্ভিকা বাণীর ('মন্ত্রশক্তি') তুলনা নেই। "দুঃখী পিতার দুঃখিনী কন্যা" পতিহারা সতী বাণী তার কাছে অস্পষ্ট ছায়া মাত্র। 'মহানিশা'র দুর্মুখ দাদামহাশয়, লোভী ক্ষ্যান্তমণি, বিবাহেচ্ছু কেষ্টধন তুলির আঁচড়ে চিত্রের মত স্পষ্ট। পরন্তু, বইএর প্রধান চরিত্র নির্মল, ধীরা, সৌদামিনী অতিরিক্ত দেবভাবসম্পন্ন হওয়াতে

পাঠকের কাছে তারা কৌতূহলোদ্দীপক নয়। লেখিকা যখন কোন মাহাত্ম্য-প্রচারের উদ্দেশে রচনা-কার্য করেন না—তখন তিনি স্বাভাবিক ও সজীব স্রষ্টা। সাংসারিক ঘরোয়া কথা, মেয়েদের মনস্তত্ত্ব, চলতি কথ্য ভাষার প্রয়োগ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার চমৎকার ব্যবহার দেখায়। কিন্তু, গুরু-গম্ভীর আদর্শবাদের প্রচারে তিনি যেন মঞ্চের বক্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর নায়ক-নায়িকা গাম্ভীর্য ও বিষাদের মুখোস পরে বক্তৃতার ভাষায় কথা বলে। অথচ আত্মবিস্মৃতক্ষণের রচনায় বালিকা বধূ উর্মিমালার চতুর্দশবর্ষীয় স্বামী বিনয়ের সঙ্গে খুনসুটি, শাশুড়ি জগদ্ধাত্রীর ভালবাসা অপূর্ব ('চক্র')।

বাৎসল্যে বিগলিতা, পরিবর্তিতা ব্রজরাণী ('মা') অপেক্ষা বিলাসিনী, অভিমানিনী ব্রজরাণীকে অনেক সত্য মনে হয়। লেখিকার আদর্শ-বাদের সম্ভাব্য পরিণতি হিসাবে বহু বিরুদ্ধ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন আমরা পাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করলে এতটা পরিবর্তন সহসা সম্ভব কি না বিবেচ্য। মন্দকে ভালো করবার অহরহ সাধনায়, আদর্শবাদের প্রেরণায়, হিন্দুধর্মের সর্বথা অনুস্থিতিতে লেখিকা শিল্পীকে বিসর্জন দিয়েছেন। স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদি বিচারে নিজেকে আবদ্ধ রাখা প্রকৃত সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। নৈর্ব্যক্তিক নিষ্ঠুরতা ও বৃথা নীতিবোধ বিসর্জন—আধুনিক সাহিত্যের এই মর্মবাণী। সমগ্র জগতের পরিবর্তিত পটভূমিকায় মূল্যবোধের মানদণ্ডও যে পরিবর্তনশীল। কাজেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শে গ্রথিত সাহিত্য কি জীবনধর্মী ?

তাহ'লে অনুরূপা দেবীর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির সার্থকতা কোথায় ? আজ এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেবার দিন এসেছে। যাচাই করে জীবনকে, ধর্মকে, সাহিত্যকে আমরা দেখতে চাই। আমরা অবিশ্বাসী যুগ।

অনুরূপা দেবীর সমগ্র সাহিত্যধর্মের সার্থকতার চাবিকাঠি একটি সকরুণ মমতাবোধ। বাৎসল্যের বিহ্বল ভাব-লহরী তিনি করুণা মিশিয়ে আরও উদ্বেল করে তুলেছেন ঃ—যথা, 'মা'। ডিকেন্সের মত পাঠককে কাঁদাতে তিনি বড় ভালবাসেন। 'গরীবের মেয়ে'র মা নির্য্যাতিতা স্বর্ণলতার আকৃতির বর্ণনা মাত্রে এই সকরুণ মমতাবোধ পাঠকের মনে অনুপ্রেরিত হয়ে যায়। 'পথহারা'য় দ্বিতীয় পক্ষের বধূ ইন্দ্রাণীর বেদনা, 'মহানিশা'য় ধীরার আত্মবিসর্জন, 'উত্তরায়ণে' আদরিণী আরতির অভাবে নার্সগিরি, 'পথের সাথী'র জমিদার পুত্র শশাঙ্কের প্রেমের জন্য দুঃখবরণ, সমস্ত কিছুই পাঠকের মনের এমন স্থান স্পর্শ করে, যেখানে বিচারবুদ্ধি নীরব। 'মন্ত্রশক্তি' ও 'মা' উপন্যাসের শেষাংশ পাঠ করে চোখের পল্লব শুষ্ক, এমন পাঠিকা বোধ হয় নেই। মানুষের দুঃখদৈন্য, বৈফল্য অনুরূপা দেবীর ভাষাকে করে তোলে মর্মস্পর্শী এবং তাঁর ক্ষমতাশালী লেখনী অভ্যস্ত ভঙ্গিতে বেদনাবোধ পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেয়। তিনি মহিলা, মহিলা-চরিত্রের বেদনা বিশেষ করে তাঁর রচনায় কারুণ্যের উপাদান যোগায়। সমস্ত বইগুলি আচ্ছন্ন করে ফেলে বেদনার কুয়াশা, করুণার অশ্রু। দুঃখ না পেয়ে তাঁর বই পড়া যায় না। এই দুঃখ দেবার ক্ষমতাই হয়তো তাঁর প্রধান বিশেষত্ব।

আমার জীবনে অনুরূপা দেবীর কোন একখানি পুস্তক অবিচ্ছিন্ন ভাবে জড়িত হয়ে আছে। সে কথাই বলছি অবশেষে।

আমার মাতা লেখিকা শ্রীগিরিবালা দেবী আমার জন্মসূচনার সময়ে একখণ্ড 'মন্ত্রশক্তি' পাঠ করেছিলেন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে এবং দীর্ঘ দিন ধরে। ফলে, তাঁর মতে pre-natal প্রভাব নাকি একটা পড়েছিল। আমার ছোট কাকা শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় অতঃপর 'মন্ত্রশক্তির' নজিরে আমার নাম 'বাণী' রেখেছিলেন। মাতার মতে, আমার

বিবাহবিদ্বেষ ওই বাণীর মতই—বাণীর চরিত্রের একাগ্র অনুধাবন করার ফলে গর্ভস্থ কন্যা না কি বাণীর মতই কিঞ্চিৎ বেয়াড়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমার নিজস্ব মতামত কিছুই নেই।

আরও একটি কথা। অনেক পরে পুরাতন বাঁধানো 'ভারতবর্ষ' কয়েকখণ্ড আমার হাতে আসে, যখন সবে একটু পড়তে শিখেছি। হল্‌দে পাতার শিথিল মলাটের, আমার জন্মের পূর্বের, 'ভারতবর্ষ'। সেখানে 'মন্ত্রশক্তির' ক্রমশঃ প্রকাশ দেখি। ছোট ছোট সুন্দর হাফটোন ব্লকের ছবি দ্বারা চিত্রিত উপন্যাস। সেই ছবি ও নীচের হেডিং আমাকে প্রলুব্ধ করে বড়দের বইএর আস্বাদ গ্রহণে জীবনে প্রথম। সুতরাং আমার বাল্যের অবসান ওই 'মন্ত্রশক্তি'র পাতায়।

অনুরূপা দেবীকে প্রথম দেখবার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে 'মন্দিরা' কার্যালয়ে। তখনও সাহিত্যিক হয়ে উঠিনি। সামান্য কবিতা মাত্র কয়েকটি প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং ভীড়ের মধ্য থেকে বিমুগ্ধ আমি অনুরূপা দেবীকে দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করেছি। ভেবেছিঃ ইনিই সেই লেখিকা, যাঁর নায়িকার নামে আমারি নামকরণ। তাঁকে দেখবার জন্যই অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও দক্ষিণ থেকে সেদিন সন্ধ্যায় উত্তরে গিয়েছিলাম।

অনুরূপা দেবীর নায়িকার মত আমি কি না, জানি না। বাণীর পরিণতি আমার পরিণতি হ'বে কি না এখনও বলতে পারি না। কিন্তু, তাঁর অন্ততঃ একটি রচনার সঙ্গে আমার যোগসূত্র আমরণ থাকবে নিঃসন্দেহে।

কোন হাস্যরসিক

স্বনামধন্য বিভূতিভূষণ সম্পর্কে আমার একপ্রকার অভিজ্ঞতা আছে। শৈশবে বেপরোয়াভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে সবরকম বই পড়তাম। সেই সময়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দুইটি নামই একত্রে চোখে পড়ত। বলাবাহুল্য কিছুদিন যাবৎ মনে গোলমাল চলেছিল এঁরা এক লোক কিনা।

গল্প পড়বার আস্বাদে মুগ্ধ ছোট মেয়ের কাছে বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পদবী দু'টির গোলমাল হয়ে যেত। বিস্ময় বোধ করতাম 'পুঁইমাচা' পড়ার পরে 'রাণুর প্রথম ভাগ' পড়ে। মনে হ'ত দুইটি লেখার মধ্যে এত পার্থক্য কেন ? লেখা দু'টি কি করে এক লোকের হাত দিয়ে বার হয়! বাৎসল্য-করুণ রস তো দু'জনেরই উপজীব্য, কিন্তু স্বাদ কত পৃথক।

এই গোলমাল নিয়ে কিছুদিন কেটে যাবার পরে আমার পরিণত বুদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায়কে বুঝে নিতে শিখল।

তারপর সসঙ্কোচ পদক্ষেপে একদিন সাহিত্যজগতে প্রবেশ করলাম। কৈশোরসুলভ রোমান্টিক ভাবের বশবর্তী হয়ে রোমান্টিকধর্মী লেখাই পছন্দ করতাম। অতএব বিভূতিভূষণ আমার প্রিয় লেখক হ'লেন না। অকপটচিত্তে স্বীকার করছি লঘু হাস্যরসে রুচি ছিল না। সর্বত্র বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের নামের জয়ধ্বজা উড্ডীন দেখে বিস্মিত হ'লাম। আবার গোলমাল বেধে যেত; বাংলাদেশ কেন এঁর রচনা এত পছন্দ করে? প্রকাশক কেন এঁর পুস্তকের জন্য

ছোটাছুটি করে থাকেন? কেন সব কয়েকটি পত্র-পত্রিকা এঁর রচনা-ধন্য?

শুনতাম, তখন সকলের অপেক্ষা বিভূতিভূষণের রচনা অধিক বিক্রয় হয়; তিনি নামী ও দামী মানুষ। বিশিষ্ট সমালোচক অকপটে স্বীকার করেন, তিনি বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ লেখক। কেন? কি আছে এঁর মধ্যে?

ইতিমধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘাটশীলায় পরিচিত হ'লাম। একদিন সকালে তাঁর ডাহিগোড়ার বাড়ীতে গিয়ে দেখি বিভূতিবাবু একজন ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে গল্প করছেন। আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনিও লেখক। এঁর নাম বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। আমরা এঁকে 'মিতে' বলি, কারণ নাম তো এক।"

সবিস্ময়ে বললাম, "তাহ'লে ইনিই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়? ওঁর বহু লেখা পড়েছি। বাণুর গল্প, বরযাত্রীর গল্প"—

বিভূতি বন্দ্যো বাধা দিয়ে বল্লেন, "সে বিভূতিভূষণ ইনি নন। সবাই এত ভুল করে!"

তাইতো, এই ভদ্রলোককে তো humorist বলা চলে না।

ধীরে ধীরে একটি-দু'টি বই আমার প্রকাশিত হ'ল। জেনারেল প্রিন্টার্সের সুরেশ দাস তখন বিভূতি মুখোর প্রধান প্রকাশক। ওঁর কাছে বিভূতিবাবুর নানা কাহিনী শুনলাম।

আবার গোলমালে পড়লাম তিনি অকৃতদার জেনে। শিশুর মনস্তত্ব এমন সুমধুর বাৎসল্যের রংএ যিনি এঁকেছেন, তিনি পিতা হন নি! দাম্পত্য জীবনের খুঁটিনাটি এমন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে যাঁর, তিনি কোন তরুণী বধূর দয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি!

কোমল মন যাঁর হাস্যরসের রৌদ্রে ক্ষণে ক্ষণে মেঘলা রংএর করুণ রসের বুননী গেঁথে যায়, সেই মন চির একক ?

অথচ কৈশোর রোমান্সে তাঁর সহানুভূতি দেখে, তাঁর সহৃদয় সমর্থন দেখে অবাক হয়ে যেতাম। উদাসীন-নিরাসক্তের দৃষ্টি এই গল্পগুলির উপর পড়েনি। যিনি মনে মনে এই একান্ত তরল অথচ মধুর রস একবারও অনুভব করেননি, তাঁর হাতে রস এমন করে ধরা দেয় না।

তবু রোমান্টিক মন তুচ্ছ খুঁটিনাটি, সামান্য দিনযাপনের সহজতা, ধীনির্ভরবিহীন হাস্যরস পছন্দ করেনি কোনদিন। সাহিত্যবিচারে আমি উন্নাসিক। তাই পাঠকের রুচিবোধে আস্থা রাখিনি।
তারপরে 'নীলাঙ্গুরীয়ের' প্রশংসা শুনে সেখানি কৌতূহলে পাঠ করলাম। মুগ্ধ হয়ে গেলাম। 'মীরা' আর 'রাণু' ভিন্ন জগতের জীব। বিভূতিভূষণের নিজের লেখা যেন 'নীলাঙ্গুরীয়' নয়—শুধু সতুর গ্রাম্য পরিবেশ 'শারদীয়া', 'হৈমন্তীর' লেখককে স্মরণ করায়। বইটির সমালোচনা গুণীমহলে করেছিলাম। নায়ক হচ্ছেন super sensitive,— এত বেশী মাত্রায় যে খুঁৎখুঁতে বলা চলে। নায়কের এই অতি-সচেতন মনকে শুধু মাত্র অভিমানী বলে বিতর্ক মিটিয়ে দেওয়া যায় না। বিষমিশ্রিত হীরার নীলা হয়ে যাওয়ার সঙ্গে মীরার ভালবাসার উপমাটি সুন্দর। উপন্যাসখানির মধ্যে মধ্যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ নৈর্ব্যক্তিক বলে আমার মনে হয়নি।

বরযাত্রী বিভূতিভূষণের হাতে নীলাঙ্গুরীয়। পুনরায় বিস্মিত হ'লাম। কি করে সম্ভব ?

ইতিমধ্যে একদিন দেখলাম আমার অতিশয় গুরুগম্ভীর ও পণ্ডিত দাদা ডক্‌টর্ সুশীল রায় বিভূতিভূষণের 'বরযাত্রী' পড়ছেন মনোযোগ সহকারে। বিভূতিবাবুর কয়েকটি বই আমি

কিনেছিলাম। আমার দাদাকে আরও কয়েকটি উপহার দিলাম। অবশেষে দেখলাম যে-দাদাকে উদয়শঙ্করের নাচ পর্যন্ত দেখানো যায়নি, তিনি দশ বছরের মধ্যে প্রথম সিনেমায় যাচ্ছেন বিভূতিভূষণের বই সিনেমায় দেখতে। বাবার টেবিলে বই রেখে দেখলাম, তিনিও প্রীত। বলাবাহুল্য তাঁর সাহিত্যবোধ উচ্চাঙ্গ। অতএব মনসংযোগ করে আমিও পড়লাম, ইতিপূর্বে যা চোখ বুলিয়ে সরিয়ে রেখেছি। আমার অত্যন্ত ভাল লাগল। প্রতিটি গল্প একাধিকবার পড়লাম। আমাকে প্রকাশকেরা বিভূতিভূষণের হাস্যরস উপহার দিতে লাগলেন আমার বিভূতি-সাহিত্যে প্রীতি হেতু।

কিন্তু, এই একমাত্র লোক, যাঁকে দেখতে পারলাম না। তিনি প্রবাসী, তাঁর আমার এক মণ্ডলি নয়। অথচ তিনিই বোধহয় একমাত্র খ্যাতিমান সাহিত্যিক, যাঁকে চেনা গেল না। একে-ওকে বলতে লাগলাম বিভূতিবাবুকে দেখার ইচ্ছা আছে, এলে যেন খবর পাই।

তারপরে সহসা একদিন 'মিত্র ও ঘোষে' দেখা হয়ে গেল। আবার গোলমালে পড়লাম।

গম্ভীর, স্বল্পভাষী লোকটি। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, সুনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা। হাসি বিরল ও মৃদু। আরও একবার 'মিত্র ও ঘোষে' দেখলাম। একবার সুরেশ দাসের ওখানে দেখলাম। তিনটি সাক্ষাতের আলোকচিত্র একেবারে একই গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লাম।

অন্তরঙ্গ পরিবেশে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় কেমন জানি না। বাহিরের দর্শক চক্ষে তিনি রাশভারী, সংযত পুরুষ। প্রাণখোলা সাহিত্যিক অথবা সহজ হাস্যরসিক তাঁর মধ্যে গুপ্ত অবস্থায় হয়তো বাস করেন। এই ব্যক্তি 'দ্রব্যগুণ', 'রংলাল', 'নাক' প্রভৃতি গল্প

লিখেছেন বলে মনে হয় না। আবার তাঁর জগতে শিশুর মেলা নিয়ে তিনি কেন শিশু-স্বভাব নয়? তবে কি এই লেখক মানসবিলাসী?

কিন্তু, সেখানেও আমরা ভুল করি। বাৎসল্য ও করুণ রস উপজীব্য করে যা তিনি লিখেছেন, তার মধ্যে ল্যাম্বের মত বেদনা .নই। আগুনের পাশে বসে কল্পনা-বিলাসী নিঃসঙ্গ মনের চিন্তা তাঁর রচনা নয়। হাস্যরস তাঁব বাহন, অতএব তাঁর জগতে তিনি আশ্রয় পেয়েছেন। তিনি বন্ধুবিলাসী না হ'লেও নিঃসঙ্গ নন।

আচ্ছা, তাঁর বহিপ্র্কাশ তাঁব মিল দেখায় 'নীলাঙ্গুবীয়ের' শৈলেনেব সঙ্গে। এই 'শৈলেন' চরিত্র লেখকের বেনামদাররূপে বহু আখ্যায়িকায় প্রবেশলাভ করেছেন। ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণের অপেক্ষা গল্পলেখক বিভূতিভূষণেব মূল্যই অধিক। উপন্যাসপ্রিয় বাংলাদেশে ছোট গল্পেব খ্যাতির ওপর তিনি অধিষ্ঠিত। তাই প্রধানতঃ আমাদের তাঁব গল্পগুলিব কথাই মনে পড়ে।

গভীর মানসিকবৃত্তিসম্পন্ন এবং কিয়ৎ পরিমাণে আত্মরতিসম্পন্ন ব্যক্তির হাস্যবসিক হওয়াটা সত্যই গোলমেলে ব্যাপার। তীক্ষ্ণধী, অন্তর্দৃষ্টিশালী এই সাহিত্যিক অবশ্যই জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বাছাবাছি কবতে অভ্যস্ত। তিনি বিদ্রূপমুখর হ'লেন না, হ'লেন অনাবিল হাস্যরসিক। মোহিতলাল বিভূতিভূষণের রচনাকে, পুরোহিত দেবতার জন্য শুচিস্নাত হয়ে পবিত্র পায়েসান্ন প্রস্তুত করছেন,—এমনি তুলনায় তুলনীয় করেছেন। আমবা অতদূর যাব না, তবে স্বীকার করব তাঁর রচনা কলুষমুক্ত।

কলুষমুক্ত মানে কি? যে রচনায় খোঁচা নেই, যে রচনায় তথাকথিত যৌনবিকৃতি নেই। ভাষা ঐশ্বর্যশালী, ভাষাভঙ্গি গুরুগম্ভীর হ'লেও জটিলতা বিভূতিভূষণের রচনার স্বাভাবিক প্রসাদগুণকে ব্যাহত

করেনি। কিন্তু মানুষটির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে সহজতা আছে বলে আমার মনে হয়নি। 'বাসর' পড়ে লেখককে ধরতে চাই। 'সহুরে', 'উপবাসী', 'মেঘদূত' পড়ি, ভাবি এত তরল রস লেখকেরও মনকে কি লেখবার সময়ে চটচটে করে তোলে নি? তখনি 'সবজান্তা', 'বিপন্ন' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে লেখককে পাই, যিনি নিজে দূর থেকে এবং উর্ধ্ব থেকে নির্লিপ্ত সকৌতুক দৃষ্টিতে অধোদেশকে দেখতে পান। সুতরাং তাঁর হাস্যরসের রূপটি পরিহাস।

সকৌতুক পরিহাসে তিনি পরিহাস করে চলেছেন, নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে, একমাত্র 'বাদল' বা 'পোনুদের' হাতে তিনি ধরা দিয়েছেন। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বিচারে সমালোচক মন তাঁর শিশুর বিচারে বিচারকের আসন থেকে নেমে এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানুষের বিচারে পরিহাস দিয়ে বিচারপ্রবণতাকে লেখক আবরিত করেছেন। তিনি যে নির্মম দর্শক, এমনভাবে ধরা দেবার ইচ্ছা নেই তাঁর। তিনি ভীত।

তাইতো দেখেছিলাম। অধরের পাশে কঠিনতা বিভূতিভূষণের; যেন আলাপ-প্রত্যাশীর প্রশ্রয় নেই। কিন্তু চোখের দৃষ্টি ভীরু। পরস্পরবিরোধী ভাব একজনের মধ্যে দেখে বিভ্রান্ত বোধ করেছিলাম। তাঁর ভয় কিসে? · জীবনকে তিনি ভয় করে ইনটেল্‌কটের হাত থেকে মুক্তি নিয়েছেন সারা পৃথিবীতে হাসির উপাদান খুঁজে বেড়িয়ে? যে শিশুদের তিনি এত ভাল বেসেছেন, তাদের একটিকেও কি তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠা করেছেন? যে ফুল তিনি যত্ন করে ফুটিয়েছেন, কোন্ বন্ধুর হাতে তার কয়টি উপহার দিয়েছেন; হাসি দিয়ে গভীরতাকে আবৃত করেছেন—গভীরতার সহজ প্রকাশ অন্য পরিখায় তিনি প্রবাহিত করেছেন। তাঁর বহু রচনায় অন্তর্লীন ফল্গু অন্য রস, হাস্যরস নয়। সেই রসের অবিকল প্রকাশকে

তিনি পরিহার করেছেন, যেমন করে পরিহার করেছেন নরনারীর প্রেমের দুর্বার আবেগ ও বেদনাকে। প্যাশনের সিন্ধুনীর তাঁর পরিধেয়ের কোন প্রান্ত সিক্ত করতে পারে, তাই তিনি সিন্ধু-সিকতার যাত্রী নন। পরিহাসের বর্ম এই শক্তিশালী লেখককে রক্ষা করেছে। তিনি মোটেই সহজ নন।

কিন্তু, তিনি তো আমাদের অনেক দিলেন। কত তিনি আমাদের দিয়েছেন! কৈশোরে জীবনেব প্রতি পদক্ষেপে হাসি বাজত, বইএর পাতায় সে হাসির সাক্ষাৎ না পেলেও ক্ষতি হ'ত না। কিন্তু পরিণত বয়সে দিনযাত্রার কঠোর পরিধির মধ্যে সেই হাসি হারিয়ে যায়। আমরা খুঁজে মরি। ব্যর্থতা ও জ্বালা থেকে মুক্তি এনে দিল বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাহিনী। তাই তিনি জনপ্রিয়।

তাই আমার হাসির দিন শেষ হয়ে গেলে তবে আমি তাঁর মূল্য বুঝতে পারলাম।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় সংক্ষিপ্ত। সভাস্থলে বা জনতার মধ্যে কেবলমাত্র সাক্ষাতে সেই আলাপের পূর্ণচ্ছেদ। কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্ত্ত তাঁর সাহচর্যে কাটানো আমার সৌভাগ্য হয়নি।

তবে, তাঁর অকাল মৃত্যুতে তাঁর বিষয়ে লিখি কেন ? আমি তো মনে করি সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে পদচারণ না করে তাঁর বিষয়ে রচনা অনেকটা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের উত্তরের প্রথা। ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতি ঔপন্যাসিক আর আমার দেশের ছেলে মাণিক এক দৃষ্টিপাতের লক্ষ্য হ'তে পারেন না। সুদূরচারী পাঠকের দৃষ্টি নিয়ে কোন সাহিত্য-কর্মীর নিজের দেশের সাহিত্যিকের বিষয়ে লেখা অপরাধ।

তবু, কেবলমাত্র অনুরোধে নয়, কেবলমাত্র কলম-কণ্ডুয়নের জন্য নয়— আমি লিখছি গভীরতর কোন মনোবৃত্তির অনুশাসনে। জীবনে যাঁর সন্নিকটস্থ হইনি, জল বাতাসের মত যাঁর উপস্থিতি আমার কাছে স্বয়ংসিদ্ধ তথ্য ছিল, তাঁর মৃত্যুবাসরে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন থেকে আমিই বা বাদ পড়ব কেন ? মৃত্যুর অন্ধকার যবনিকার পাদপীঠে অসংখ্য স্মৃতিপ্রদীপ। অন্ধকারের করগ্রাস থেকে জীবনের আলোক সেই সব ভীরু দীপশিখা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসী। আমার প্রদীপটি যতই না কেন ক্ষীণ হোক, আমারি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের তো সাক্ষী হ'বে।

অল্প বয়সে পুরাতন 'পূর্বাশার' পাতায় সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম আমি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। 'পদ্মানদীর মাঝির' রচনা-শৈলী কেমন যেন লেগেছিল অপরিণত মনের কাছে। কৌতুহলী হয়ে পড়ে গেলাম। একটি ধূসরাভ বর্ষার দিন। বিষন্ন আকাশের নীচে

বাংলা দেশের ব্যাকুল বর্ষণ, তার মধ্যে পড়লাম বাংলার পদ্মানদী-তীরের আদিম জীবনী—জলের দেশের মানুষের। মনে হ'ল, এমন রচনা আর পড়িনি।

কিন্তু সমগ্র জগৎ আচ্ছন্ন করে বেজে উঠল একটি বিষাদের সুর, একটি রূঢ় জীবনদর্শন। পল্লীগ্রামের শ্যাম লতাগুল্মের অন্তরালে শুধু যে স্নেহ নিঃসৃত হয় না, এমন উপলব্ধি শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজে' পেয়েছিলাম। আরও অনেক অগ্রসর হয়ে এলেন 'পদ্মানদীর' লেখক। অর্থনৈতিক সমস্যার স্বীকৃতির সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তির অকপট স্বীকৃতি ও ফলে জীবনের বিকৃতি—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের সাহিত্যের উপজীব্য এই।

তারপরে পেলাম হাতে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। কেমন দুঃখ, অতৃপ্তি, অস্বস্তি নিয়ে পড়লাম,—অদ্ভুত সে আকর্ষণ। জটিল পথে লেখক পণ করেছেন তাঁর পাঠককে নিয়ে যাবেন। প্রাত্যহিক জগতের, প্রতিদিনের মানুষের, সাধারণ হৃদয়বৃত্তির অন্তরূপ দেওয়া তাঁর কাম্য।

বিস্ময় বোধ হ'ত, গ্রাম্য মানুষের অন্তরের কথা কত সহজে নাগরিক লেখক প্রকাশ করেছেন। চাঁদের দিকে চেয়ে গ্রাম্য বধূ কুসুমের ভাবান্তর। শহরবাসিনী নায়িকার মানসিকতা লেখক সেখানে আরোপ করেননি। অথচ প্রেমের সর্বগ্রাসী ব্যথা গ্রাম্য বধূর মনে অবৈধভাবে প্রবেশ করতে যে পারে, তা-ও স্বচ্ছন্দ সাবলীলতার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নায়িকার মনে কবেকার শোনা 'ময়মনসিংহ গীতিকার' পদ ভেসে এল :

"ভিন্‌দেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইল কন্যা পেরথম যৈবন।"

অতি নিবিড়ভাবে লেখক তাঁর নায়িকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাব অনুভব করেছেন। তাই তিনি 'পুতুলনাচের ইতিকথা'য় কুসুমকে দিতে পেরেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পড়তে পাচ্ছিলাম কতকগুলি গল্প, যাদের সমালোচক 'ভয়ঙ্কর' বলে আখ্যা দিয়েছেন, যথা 'প্রাগৈতিহাসিক', 'সরীসৃপ' প্রভৃতি গল্প। পড়লাম 'সহরতলী', 'অহিংসা' ইত্যাদি আখ্যায়িকা। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, পারিবারিক সম্পর্কের গলদ, সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভার একটি ধারা পাওয়া গেল। রাজনৈতিক চেতনায় অনুপ্রেরিত হয়ে উঠতে লাগল লেখকের শিল্পকর্ম।

ফ্রয়েডিয় যৌনবাদ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাকে প্রভাবিত করেছিল, এমন কথা সকলেই জানেন বা মানেন। সুস্থ মানুষের কোন দিকে ব্যতিক্রম লক্ষণীয় হলে সেই ব্যতিক্রমের মূল সূত্র আবিষ্কার করার সঙ্গে সত্যনির্ণয় হয় ফ্রয়েডের মতে। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে সুস্থ দেখেন কদাচিৎ। তাঁর সমাজের মানুষগুলি সকলেই বিকৃত প্রায় সব দিকে। ফ্রয়েডের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মাণিকীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান পার্থক্য এই। নিউরোসিস মাণিক-সাহিত্যে স্বাভাবিক বস্তু, ব্যতিক্রম নয়। নিউরোটিক ব্যক্তির নিরীক্ষা সর্বদাই শিল্পের লক্ষ্য নয়।

শেষোক্ত অধ্যায়ে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনীতিক ছায়াছন্ন দৃষ্টিদ্বারা জগৎকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সাহিত্য প্রচারধর্মী হওয়া উচিত কি না, সে বিতর্কের স্থান অন্যত্র। গোর্কির 'মাদারকে' প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্য বলে ক্ষুণ্ণ করা যায় না। সেক্‌স্‌পীয়রকে প্রচারক বলেও তাঁর সাহিত্যের অমরত্বকে খর্ব করা চলেনা। অতএব রাজনীতি-বিলাসী মন যদি 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী' হয়, আমরা

আপত্তি করবনা। আমরা শুধু চেয়েছিলাম মাণিকসাহিত্যে সাম্যবাদও দ্বিতীয় 'পদ্মানদীর মাঝির' জন্ম দিয়ে যাক। সেই প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি।

সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষা যে, সাহিত্য রসোত্তীর্ণ হয়েছে কিনা। যদি হয়, বিষয়বস্তু নিয়ে আমরা চিন্তা করব না কখনও। লেখক যদি পাঠকের মনে বর্ণনার সমধর্মী উপলব্ধি জাগাতে পারেন, তবেই তিনি রসিক। কিন্তু মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষোক্ত রচনা সেই অর্থে কতটা সার্থক ?

বাংলা সাহিত্য ধীশক্তির যতই গৌরব করুক না কেন, নিঃসন্দেহে দেখেছি রোমান্টিক রচনার প্রতি ভক্তির আতিশয্যে আমরা বিহ্বল। তাই বঞ্চনা, দারিদ্র্য, নিষ্ঠুরতার মধ্যেও যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় তথাচ রোমান্টিক, আমরা তাঁকেই ভালবেসেছি। বিস্ময়ের কিছু নেই। বাংলার অঙ্গে অঙ্গে রোমান্স বা ছদ্মবেশী রোমান্সের শয়ন আস্তৃত। গাত্রবিস্তার করলেই হয়। এ দেশের বা এ ভাষার এই ধর্ম। শীতের দেশে যেমন শীতবস্ত্র প্রয়োজনীয়, বাঙালী মনকে রসস্থ করতে হলে রোমান্টিক কল্পনা তেমনই প্রয়োজনীয়, হোক না কেন তা 'প্রাগৈতিহাসিকের' মত বীভৎস কল্পনাসিঞ্চিত। এ সাহিত্যে রোমান্টিক ভাবধারা খোলে বেশী। তাই মাণিক সাহিত্যের সর্বগ্রাহ্য রোমান্টিক আবেদন যেমন প্রাণস্পর্শী হয়ে রইল, সাম্যবাদী আদর্শের আবেদন ততটাই সঙ্কীর্ণ বলে প্রতীয়মান হ'ল। অকালমৃত্যুর ফলে লেখকের প্রতিভা বৃহত্তর প্রয়াসের মধ্যে বিলীন হ'তে পারল না। তিনি অকৃত্রিম হ'তে চেয়ে নিরঙ্কুশ সত্যের সন্ধানে হয়তো বা শিল্পী আত্মার বিলোপ সাধন করতে কুণ্ঠিত হননি।

বঙ্গবাসী কলেজের 'সারস্বত সম্মেলনের' কথা মনে পড়ছে। কথা সাহিত্যের বক্তৃতায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় আহুত হয়েছিলেন। তাঁর

পাশে বসবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল কাব্য সাহিত্যের বক্তারূপে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষণ দিলেন, অতি সহজ সাধারণ কথাবলার ভঙ্গি, অলঙ্করণের তিলমাত্র প্রয়াস নেই। তিনি বললেন যে, তাঁর কথা বলার অসুবিধা হচ্ছে, কারণ তিনি কতকগুলো দাঁত তুলেছেন। বেশ একটু সময় নিয়ে, অন্তরঙ্গ বন্ধুকে কথাবলার ভঙ্গিতে তিনি বিরাট সভাকে জানালেন যে, তিনি কতগুলো দাঁত তুলেছেন এবং সেজন্য কত অসুবিধা তাঁর হয়েছে।

আমি ভাবলাম, কথাটার মূল্য কি এতই বেশী যে এতটা সময় তিনি নষ্ট করলেন বিকৃত একটা সুর টেনে এনে ?

আজ উত্তর ভেবে পাই, ঘোরতর আদর্শবাদী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন সত্য সন্ধানের ক্ষেত্রে। যা সত্য, তা যত বিকৃত হোক না কেন, তিনি তার সন্ধান করবেন। অন্যের ভাল লাগুক বা নাই লাগুক তিনি উপস্থাপিত করবেন তাঁর সত্যকে। তাঁর সাহিত্যে সৃজনকর্মও তাঁর চরিত্রের এই দিকটির অনুরূপ। রসসৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য নয়, সত্য তাঁর লক্ষ্য। বিকৃত সত্যের সন্ধানে, অবিকৃত প্রকাশে তাঁর সাহিত্য তাই কখনও বা পথভ্রষ্ট। ব্যর্থতাবোধ যখন শিল্পীর জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সামঞ্জস্য লাভ করে, তখনই তার গ্রহণের মধ্যে সাবলীলতা আসে। নয়তো উদ্ধত একঘেয়েমি আত্মম্ভরিতার নামান্তর মাত্র। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি অতটা সত্যনিষ্ঠ না হ'তেন, তাঁর শেষ যুগের সাহিত্যে আর একটু রসের সমাবেশ ঘটত। সত্যের শেষ বা চরম সন্ধানও তাঁকে পূর্ণতা দিয়ে গেল না। সত্যের সন্ধান জীবনে তাঁকে বিক্ষিপ্ত করেছিল, অভিমানী শিল্পীমন সমাজের দ্বারে খুঁজেছিলেন সামঞ্জস্য, জীবনে চেয়েছিলেন

আশ্রয়। আশ্রয়হীনতায় প্রতিহত বিক্ষিপ্ত প্রতিভা সৃষ্টির আনন্দের মধ্যেও বিষপাত্র তুলে নিয়েছিলেন ; যথা ঃ—

"প্রহরে প্রহরে দেব বোতলে বোতলে।
মর্মের মন্থন জাত সঞ্জীবনী ঘৃণা,—"

('আমি ধাত্রী'-মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পিয়ের কাঁলো মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মোপাসাঁর তুলনা সম্পর্কে বলেছেন যে "মোপাসাঁর বর্ণনা কতকটা নিষ্ঠুর…মাণিকে সেই নিষ্ঠুরতার লেশমাত্র নেই।"

আমাদের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ। মোপাসাঁর নিষ্ঠুরতায় মজলিসি শ্লেষ মিলেছিল, মাণিকের নিষ্ঠুরতা নিছক নিষ্ঠুরতা। ছোটগল্পগুলো থেকে উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

এই নিষ্ঠুরতা সাহিত্য থেকে জীবনে নেমেছিল। জীবনে তিলমাত্র মমতাবোধ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় রাখেননি। যে জীবনে মহত্ব আছে, সে জীবন অপরিচিত ছিল। পদ্মার চড়ে অবশ্য—"ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতার পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না।" কিন্তু জীবন দেবতার রূপের অন্য দর্শনও আছে। সুরাপাত্রে তৃষ্ণার শান্তি থাকেনা, থাকে গাঙ্গেয় নীরে। অপুর্ণ জীবনদর্শনে জীবনের অখণ্ড সামগ্রিক রূপ শিল্পীর চোখে হয়তো ধরা দিতে পারেনি। তাই মাণিক-সাহিত্য উজ্জ্বল প্রতিভার ক্ষণদীপ্তিতে দৃষ্টি সচকিত করে তোলে, কিন্তু সন্ধানী দীপের স্নিগ্ধ শেষ রশ্মিটি পাই কোথায় ?

প্রেরণার উৎস

আকাশের কোণে কাল বৈশাখীব উদ্দামতা দেখা দিয়েছে। এমনি অনেকদিন আগে এক বৈশাখে সমগ্র গতানুগতিকতার শৃঙ্খল বন্ধনহীন এমনি ঝড়েব মত উড়িয়ে, বাংলা সাহিত্যে যে উদ্দাম নায়ক আবির্ভূত হয়েছিলেন, সেই ববীন্দ্রনাথ ঠাকুবকে এমন দিনে স্মরণ করি।

বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জায় যে সাহিত্য মিশেছে, সে-ই সাহিত্যিকেব পূজা—তাঁর সাহিত্যেব প্রকৃত মানদণ্ড নির্ণয় করা। ভাববিলাসেব হাল্কা হাওয়ায় কথার বেলুন উড়িয়ে নেতি-নেতির পথে সানুনাসিক স্তবপাঠ অনেকদিনই করেছি। বিজ্ঞানবিদের মন নিয়ে রবীন্দ্রনাথেব রচনা সম্পর্কে ভাবোচ্ছ্বাসহীন গবেষণা এখন বাঙ্গালীব একমাত্র কর্তব্য। গবেষণামূলক তথ্য যিনি আজ দেশকে, ভবিষ্যৎ রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠককে উপহার দেবেন, তিনিই প্রকৃত রবীন্দ্রনাথের কর্মী। সন-সাল মিলিয়ে, ইংরাজী রচনাকে বিবেচ্য বিষয় ধবে, প্রত্যেকটি প্রবন্ধ হওয়া উচিত বিজ্ঞানধর্মী। যুক্তির আলোতে অনেক তথ্যই নূতন রূপ নেবে নিঃসন্দেহে। নেওয়াই উচিত। গবেষণার আলোকপাতে বহু ভাবনীহারিকা এমনি বিচ্ছিন্ন হয়ে সত্যের জন্ম দিয়েছে।

ববীন্দ্রজীবনের একটি দিকও অনেকদিন অস্পষ্ট ছিল। সেই জীবনে প্রেরণার উৎস সম্বন্ধে আলোচনায়. অতি সংক্ষিপ্তভাবে, আমরা এক স্বল্প বিদিত তথ্যে উপনীত হব অভ্রান্তভাবে। কবিব বিরাট বহুধা সৃষ্টিব

আদিযুগে কবি কতটা অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন পরম আত্মীয়ার কাছ থেকে, আমাদের জানা দরকার। জানা দরকার, 'কবির অন্তরে কবি' ছিলেন কে। যে কোন সৃষ্টিকার্যের মূলে থাকে প্রেরণা, প্রেম অথবা স্নেহ। শুধু ভক্ত জনের শ্রদ্ধা দিয়ে শিল্পীর মনে অনুপ্রেরণা জাগানো চলে না। শিল্পী চায় একজনের কাছে অবনত হয়ে ধরা দিতে।

রবীন্দ্রনাথেরও কবি জীবনের আদিতে এই অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়েছিল। সুখের বিষয়, 'সাহিত্যের সঙ্গী' গৃহেই ছিলেন অন্তরঙ্গ আত্মীয়ারূপে। এ সাহিত্যসঙ্গী, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্নী শ্রদ্ধেয়া কাদম্বিনী দেবী, (ঠাকুর বাড়ীর নাম, 'কাদম্বরী')। কাদম্বরী দেবীকে বিভিন্ন আখ্যায়িকায় রবীন্দ্রনাথ 'নূতন বৌঠান', 'ছোট বৌঠান' ; 'বৌ ঠাকরুন' ইত্যাদি নামে উল্লেখ করেছেন। কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় ছিলেন, (১৮৫৯-৮৪)।

'জীবন স্মৃতি' ও 'ছেলেবেলা' পাঠ করে কাদম্বরী দেবীর ইতিহাস বেশ জানা যায়। হিমালয় ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন আস্বাদ এল। এই আস্বাদ অন্তঃপুরের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় 'অন্তঃপুরে বাধা ঘুচিয়া গেল··· আমাদের বাড়ীর যিনি কনিষ্ঠ বধূ ছিলেন, তাঁহার কাছ হইতে প্রচুর স্নেহ ও আদর পাইলাম।' তখন রবীন্দ্রনাথের বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাদশ। এই আদর ও স্নেহ মৃত্যুর পূর্বাহ্ণ পর্যন্ত কবি ভুলতে পারেননি। তাঁর সুদীর্ঘ ও বিচিত্র জনসমাকুল জীবনে বৌঠাকুরুণের স্নেহ মনের কোনও গোপন মণির মত পরম সমাদরে রক্ষিত ছিল। 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে কবির শেষ জীবনের স্মৃতিতে কবির মুখে ক্রমাগত বৌদিদির উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিঃসঙ্গ বালক জীবনকে স্নেহরসসিক্ত করে নূতন অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন কাদম্বরী দেবী।

তিনি অতি অল্প বয়সে নিঃসন্তান অবস্থায় আত্মহত্যা করেন, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিল চবিবশ মাত্র। কিন্তু, দুর্লভ স্নেহস্মৃতি এক দিনের জন্যও কবির মন থেকে অন্তর্হিত হয়নি। 'কবির অন্তরে কবি' হয়েই কাদম্বরী দেবী কবি মানসে চিরস্থান লাভ করেছিলেন। 'ছড়ার ছবি' বইতে 'বালক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :—

জুটেছি বৌদিদির কাছে ইংরেজি পাঠ ছেড়ে,
মুখখানিতে ঘের দেওয়া তাঁর শাড়িটি লাল পেড়ে"—

'ছেলেবেলা' বইটিতে বিশদভাবে বৌদিদির বর্ণনা, তাঁর ব্যবহার, তাঁর স্বভাবের কথা লেখা আছে।

কাদম্বরী দেবীর বিবাহ হয়েছিল ১৮৬৮ খৃঃএর ১৩ই জুলাই··· "বাড়ীতে এল নূতন বৌ কচি শামলা, হাতে সরু সোনার চুড়ি'··· (পৃঃ ৫৩) শিশু রবীন্দ্রনাথ নূতন মানুষটির পরিচয়ে উৎসুক হয়ে উঠলেন, কিন্তু অন্দরের শাসনে তা সম্ভব হ'ল না। তবে মহর্ষির সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণের পরে রবীন্দ্রনাথ সহসা অন্দর মহলের সমাদর লাভ করলেন, প্রথমে জননীর কাছে, দ্বিতীয়তঃ বৌদিদির কাছে ('জীবন স্মৃতি,' 'প্রত্যাবর্তন')। এধারে বাড়ীর কর্ত্রী বাড়ীতে নূতন আইন চালিয়ে বৌ ঠাকুরুণের জায়গা করে দিলেন ছাদের লাগাও ঘরে। তারপর···"ছাদের রাজ্যে নূতন হাওয়া বইল, নামল নতুন ঋতু"···। জ্যোতি দাদা ও বৌঠাকুরুণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নতুন জগৎ আবিষ্কার করলেন সেই তেতলার ছাদে। 'ছেলেবেলা' বইখানি ও অন্যান্য ইতিবৃত্ত থেকে আমরা জানতে পারি, ছাদে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় গানের ও সাহিত্যের আসর বসত। কবি একটি একটি গান রচনা করে জ্যোতিদার বেহালার সুরে গাইতেন। শ্রোতা হ'তেন বৌঠাকুরুণ। সাহিত্যে বৌঠাকুরুণের যথেষ্ট নিষ্ঠা ও অনুরাগ ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যচর্চার অংশী ছিলেন, ('জীবনস্মৃতি"

'সাহিত্যের সঙ্গী' ও 'ছেলেবেলা' ১২ অধ্যায়)। কাদম্বরী দেবীর সাহিত্যপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মনকেও যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল, এ প্রমাণ আমরা বহুবার পেয়েছি। সেইদিনগুলি যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন ছিল, একথা কবি অসংখ্যবার স্বীকার করে গেছেন। বস্তুতঃ সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত, ভ্রমণ সমস্ত কিছুতেই কাদম্বরী দেবী রবীন্দ্রনাথকে সুনিবিড় সাহচর্য প্রদান করেছিলেন।

সতের বছর বয়সে কবি বিদেশ গেলেন। বিলাত থেকে ফিবে এসে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আশ্রয়ে চন্দননগরে গঙ্গার ধারের বাগান বাড়ীতে বাস করতে লাগলেন। তখন আবার কবির জীবনে কতকগুলি সুন্দর দিনের উদ্ভব হ'ল বৌদিদির সাহচর্যে, ('জীবনস্মৃতি') 'গঙ্গাতীর')। কিছুকাল জ্যোতিদাদার আশ্রয়ে কাদম্বরী দেবীর সাহচর্যে এখানে ওখানে রবীন্দ্রনাথের বহু চমৎকার দিন কেটে গেল। এর মধ্যে পরিজনদের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ বিবাহ করলেন। বিবাহের পর বৎসর অকস্মাৎ কাদম্বরী দেবীর আত্মহত্যায় রবীন্দ্রনাথ জীবনে প্রথম নিদারুণ শোকের স্পর্শ পেলেন। ইতঃপূর্বে মাতার মৃত্যুতে কবি যে শোক পেয়েছিলেন, সে শোক কাদম্বরী দেবীর স্নেহস্পর্শে বিদূরিত হয়েছিল।

কিন্তু "চব্বিশ বছর বয়সের সময়ে মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হলো তাহা স্থায়ী পরিচয়।" এই সূত্রে রবীন্দ্র রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ড 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' প্রকাশিত একটি পত্রে এবং 'পুষ্পাঞ্জলি' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথের শোকোচ্ছাসের প্রকৃতি ও গভীরতা অনভিজ্ঞ পাঠকের চোখেও ধরা পড়বে। বাহুল্যবোধে আমরা উদ্ধৃত করছি নো। সুদীর্ঘ দুই বৎসরাধিককাল রবীন্দ্রনাথ এই শোকে মুহ্যমান অবস্থায় কঠোর আহার নিয়মাদি ও অশৌচ পালন করেন। কাদম্বরী দেবীর

মৃত্যুতে কবির অবলম্বনহীন অন্তরে যে ক্ষত চিহ্ন অঙ্কিত হল, সে চিহ্ন উত্তরকালে কোন দিন মোছেনি। তাঁর কাব্য বিয়োগ ও বিরহ ব্যথায় চির জীবন ভারাক্রান্ত হয়েই রইল। কৌতুহলী পাঠক রবীন্দ্র কাব্যের বিভিন্ন দিকের আলোচনায় এ সকল তথ্য সম্যক জানতে পারবেন।

এই অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালিনী মহিলার সঠিক পরিচয় আজও অনেক রবীন্দ্র কাব্যোৎসাহী জানেন না। তিনি রূপসী ও বিদূষী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবনীকারগণের যৎসামান্য উল্লেখ থেকে জানা যায় তিনি উদ্যান-রচনা ও গৃহ-সজ্জায় নিপুণা ছিলেন। তেতলার ছাদে ফুলের টবের সারিতে তিনি বাগান করে তুলেছিলেন। এবিষয় রবীন্দ্র-রচনায় জানতে পারি। আর জানা যায় কাদম্বরী দেবীর রন্ধননৈপুণ্য ও দাবা খেলায় পটুতা। দুই জনের মধ্যে খেলায় প্রত্যেকবার কবি হেরে যেতেন। কাদম্বরী দেবী স্বামীর সেবা ও যত্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন, এমন কি স্বামীর সঙ্গে সেকালে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ইডেনউদ্যান পর্যন্ত ধাবন করেছিলেন, এ কথাও জানা যায়। তিনি আলাপী ছিলেন, সাহিত্যের সমঝদার ছিলেন। রোগীর শুশ্রূষায়, পরিজনসেবায় তিনি পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর নানা বিষয়ে সখ ছিল; যথা পশু পাখী পোষা, প্রসাধনে রুচি, রান্না করে লোকজনকে খাওয়ানো ইত্যাদি। তিনি যে সীবননিপুণাও ছিলেন সে কথা জানি কবি বিহারীলালকে নিজ হস্তে বুনে আসন উপহার দেওয়াতে। এইখানে বলা কর্তব্য যে, সেই যুগের আরও একটি বিশিষ্ট কবি কাদম্বরী দেবীর গুণমুগ্ধ ছিলেন। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এই আসনটি উপলক্ষ করে 'সাধের আসন' নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। সেই কাব্যে তিনি কাদম্বরী দেবীর সাহিত্যানুরাগ ও অজস্র সদগুণের

উল্লেখান্তে তাঁর মৃত্যুতে আক্ষেপ করেন—'কোথা সেই শ্যামাঙ্গী সুন্দরী ?"—

কাদম্বরী দেবীর দুই একখানি অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আলোকচিত্র আমাদের দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সেইসব চিত্র স্বতঃই আমাদের অভিভূত করে।—কারণ এই মহীয়সী নারী জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবির মনে প্রেরণা এনেছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত জটিল ও বিশাল কবিচিত্তে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছিলেন এই অসামান্যা মহিলা। তাঁর চিত্রকে উদ্দেশ করেই কবিকণ্ঠে বেদনার সুর বেজেছে।

"তুমি কি কেবল ছবি ? * * *
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে, ঠাঁই,
আজি তাই।"

রবীন্দ্রজীবনে প্রেরণার উৎস আজ হয়তো কৌতূহল জ্ঞাপক হ'বেনা। কিন্তু প্রথম যখন এই বিষয়ে অবহিত হয়েছিলাম, তখন পূর্বসূরীদের কোন আলোকপাত দিকসীমা চিহ্নিত করেনি। আমার এই প্রবন্ধটি সর্ব্বপ্রথম ৩১শে আগষ্ট, ১৯৪৭ সনে 'স্বরাজ' দৈনিক পত্রের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে প্রবন্ধটি ৩১শে বৈশাখ, ১৩৬০ সনে 'যুগান্তর' সাময়িকীতে প্রকাশিত হ'ল পুনরায়। এখন হয়তো রবীন্দ্রজীবনের এদিকটিতে প্রচুর দৃষ্টিক্ষেপ হয়েছে, তবু এককালে পরিশ্রম করেছিলাম জন্য মমতায় তুচ্ছ রচনাটিকে ফেলে দিতে পারলাম না। যথাযথ আকৃতি সহ 'যুগান্তরের' পৃষ্ঠা থেকে প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হ'ল।

জলকল্লোল একটু শুনি

শ্রীযুক্ত প্রবোধ সান্যালকে চিনি বলতে ভরসা পাই না। একটি প্রকৃত সাহিত্যিকের চরিত্র সম্যক জানবার জন্য যতটা জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে, বা অভাবপক্ষে যতটা অনুধাবনের প্রয়োজন হয়, সবিনয়ে স্বীকার্য আমার আয়ত্তাধীন তারা নয়। বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সাক্ষাৎ লাভ করেছি। চেনা-জানার সুযোগ ও সময় পাইনি।

সাধারণতঃ, সাহিত্যিকের জীবনে আমরা তাঁর রচনার যাবতীয় তথ্য সম্পর্কে সজাগ হই। লেখক থাকেন যবনিকার অন্তরালে। তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি বা চরিত্র সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন কেউ তোলেন না। আমরা বই পড়ি, বইএর বিশদ আলোচনা পড়ি। কিন্তু যে মানুষটির লেখনীপ্রসূত পুস্তক, সে মানুষটির বিষয়ে কিছু জানতে পারি না। মন অতৃপ্ত থাকে। খুঁজে বেড়াই সেই মানুষটির বিষয়ে বিক্ষিপ্ত তথ্য। তবে 'Portraits' বা 'Profiles' সংজ্ঞাবাচক রচনার ধারা এ ধরণের অনুসন্ধিৎসাকে তৃপ্ত করে থাকে। অবশ্য সাহিত্যরসিক সাহিত্য-সমালোচনা সে সব ক্ষেত্রে পান না।

তাই আমার মনে হয়, রচনা-সমালোচনার সঙ্গে অল্প-বিস্তর রচয়িতাকে যুক্ত করলে আমরা সমালোচনা-সাহিত্যের একটি অভিনব ধারা প্রবর্ত্তন করতে পারি। রচয়িতার পটভূমিকায় রচনাকে তুলে ধরলে রচনা স্বচ্ছ হয় সমালোচক ও পাঠকের চোখে। সমালোচক যদি লেখকের কথা পূর্ব্বাহ্ণে ভেবে দেখেন, তাহ'লে সমালোচনাও সহজসাধ্য হয়ে যায় সময়ে সময়ে। কোন অপূর্ণতা অথবা বিকৃতি

লেখকের জীবনদর্শনের অপূর্ণতায় বহুক্ষেত্রে সুবোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। রচনার ধারাও বোঝা যায় সেইভাবে।

প্রবোধ সান্যাল বহুগ্রন্থের লেখক। তাঁর বহুলপঠিত, চিত্রায়িত রচনাগ্রন্থের পথ ছেড়ে আমরা একখানি অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় বইএর মাধ্যমে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করছি। তাঁকে অভিনন্দন জানাবার প্রকৃষ্ট পন্থা এই। সাহিত্যিককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ভাষা তাঁর রচনাকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন।

'জলকল্লোল' বইখানির সমালোচনা করছি। প্রবোধ সান্যাল মহাশয়ের লেখা। আমি তাঁকে একটু চিনি, হয়তো আপনিও চেনেন। কিন্তু বহু পাঠক চেনেন না। লোকমুখে হয়তো সান্যাল-মশাই চতুর্ভুজ আখ্যালাভ করেছেন, কে জানে?

যাই হোক, 'জলকল্লোল' সান্যালমশাইএর জীবনের একটি অধ্যায়। এ পুস্তক যাঁরা পড়বেন, তাঁরা যদি প্রবোধবাবুর সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকেন, তাহ'লে পুস্তকের মূল্য কি? লেখক কোন একটি বিশেষ গল্প বলতে উদ্যোগী হননি। জীবনের প্রতিপাদ্য বলে যাননি, জীবনদর্শনের খোঁজ নেই। কোন চরিত্রের পরিণতি দেখাননি। বইএর মুল্য লেখকের জীবন। বিচিত্র জীবন প্রবোধবাবুর, আভাসে জেনেছি। জীবনসমুদ্রের বাঁকে বাঁকে চলাফেরা করে অবশেষে তাঁর তরণী আজ হয়তো বন্দর পেয়েছে। জলকল্লোল লিখবার অধিকার তাঁরই আছে। সে জীবনের কিয়দংশ যদি জানা থাকে, তবেই জলকল্লোল অধিকতর মূল্যবান।

'মিত্র ও ঘোষের' কলেজ ষ্ট্রীটস্থ দোকানে বিষণ্ণভাবে বসে আছি। (আশা করি 'মিত্রঘোষ অ্যাণ্ড পার্টি' আমাকে প্রচার-পারিশ্রমিক পাঠাবেন)। সাহিত্যে সুবিধা দেখছি না। অসংখ্য বই লেখা হচ্ছে, প্রকাশিত হচ্ছে। নিত্য নূতন লেখক গজিয়ে উঠছেন।

এত বই যায় কোথায়? পড়ে কে? লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখা পুস্তকের সংখ্যা চল্লিশের ঊর্দ্ধে। অনেকে বই লিখে গেছেন অজস্র। —পড়ে কে? আমার সামান্য কয়েকখানি মাত্র বই। আমার আশা নেই। পুস্তককীট বই দেখেছি—হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে প্রবেশ করলেন প্রবোধ সান্যাল। চুল সযত্নবিন্যস্ত নয়, (এলোমেলো বলতে ভরসা হল না), পোষাক মাঝামাঝি। মুখের ভাব বোহেমিয়া ও অলকার সংমিশ্রণ।

প্রবোধবাবু আসন পরিগ্রহ করলেন। ইতিপূর্বে অনেকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। প্রত্যেকবার তাঁকে ভিন্ন বলে মনে হয়েছে। কম কৃতিত্বের কথা নয়। একাধারে এমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্রের মিলন দেখা দুরূহ। প্রবোধবাবু উৎসাহিত হয়ে আলাপ করতে লাগলেন সকলের সঙ্গে। ব্যবসার কথা, ব্যক্তি-চরিত্রের কথা, ভ্রমণের কথা, নারীর কথা, কি নয়? কখনও তিনি আন্তরিক, কখনও enigmatic, কখনও বা snob, তবু, বিভিন্ন ধারার মধ্য থেকে একটি বিশেষ ধারা আত্মপ্রকাশ করে, সেটি প্রকৃত সাহিত্যিক ধারা। ব্যবসাদারী, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার নষ্ট করতে পারে নি সেই বিধাতার অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্যকে। সাহিত্যিক কিছু ভুলতে পারেন না বলেই জানি। জীবনে প্রথমে তাঁরা বহির্জগতের কাছে অগ্রসর হয়ে যান বিপুল আন্তরিকতা নিয়ে। প্রতিদান পাওয়া যায় না, কারণ অত আন্তরিকতা তো ভিন্নপক্ষে সম্ভব নয়। যদি কোথাও ঠকেন সাহিত্যিক, তা'হলে তিনিও ঠকাতে চান। কিন্তু, ঠকানো সাহিত্যিকের ধর্ম্ম নয়, তাই ক্ষেত্রবিশেষে নিজেই ঠকে যান। জীবনে যে কঠিন দুঃখ পায়, তার শিল্পী-মন বহুক্ষেত্রে দুঃখ এড়াতে বঙ্কিম পথ ধরে।

প্রবোধবাবুর বিষয়ে এত কথা বলার কারণ, তিনি অত্যন্ত শক্তিমান লেখক হয়েও মনকে অতৃপ্ত রাখেন। অমন আশ্চর্য সুন্দর ভাষা বর্ত্তমানে অন্য লেখকের হাতে নেই। জীবনে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। তবু কেন দীর্ঘ রচনা তাঁর অসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় সাধারণতঃ? 'নিশিপদ্ম' ও 'কলরবে'র প্রবোধ সান্যাল, 'প্রিয় বান্ধবী' ও 'মহাপ্রস্থানের পথে'র প্রবোধ সান্যাল কত বড আশা দিয়েছিলেন পাঠক-মনকে! সেকি, 'আঁকাবাঁকা, 'শ্যামলীর স্বপ্নে' বা 'বনহংসী'তে শেষ কববার জন্য? তবু তো তাঁব হাতেই মাঝে মাঝে পাই 'কল্লান্ত', পাই 'জলকল্লোল'। কিন্তু প্রবোধ সান্যালের অবনতি না হোক, হয়েছে বিকাশেব অভাব। যথার্থ পরিণতি পেতে পারেননি তিনি। কেন?

আচ্ছা, মানুষ হিসাবে প্রবোধবাবু কি যথেষ্ট সম্পূর্ণ? তাঁর বুদ্ধি আছে, কথাসাহিত্যিকসুলভ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, তবু তাঁর কোন পূর্ণ পবিণত জীবন-দর্শনেব সন্ধান পাই না। তাই বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল গল্পগুলি মুহূর্ত্ত মধ্যে জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় দেখিয়ে যায়, কিন্তু বৃহৎ বচনায় মনে হয় অনেক কিছু বাকী রেখে তিনি দ্বাব রুদ্ধ করলেন।

'জলকল্লোল' বইখানি ভাল লেগেছে। বিনা সন্দেহে বইটি নূতন ধরণেব। লেখকের জীবনে জলের প্রীতি ও বিভিন্ন জলধারার স্মৃতি ২২২ পৃষ্ঠাব বইখানিব প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি মধুর করুণ আখ্যায়িকাব সূত্রে বিক্ষিপ্ত স্মৃতিখণ্ডকে লেখক জলের ধারার বন্ধনে বেঁধেছেন। তাঁর বোমাণ্টিক জীবনের এক নারী-বৈষয়ক রোমান্স—'সাধুর' কথা। অদ্ভুত চরিত্রের নারীটিকে ছবির মত চোখের সম্মুখে তুলে ধরলেও লেখক তাকে রহস্য যবনিকার আডালে রেখেছেন 'সাধু' নাম দিয়ে। নিঃসন্দেহে পাঠিকা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন জানতে

কে এই অসাধারণ রমণী ? অন্ততঃ স্বীকার করছি আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম। "সাধু জল ভালবাসতো, জলে ভাসতে পারতো —জল দেখলে অধীর আনন্দে হেসে উঠতো, তাই এতদিন পরে জলের কথাই লিখলাম।" (পৃঃ ২২০)

বিচিত্র, যাযাবর জীবন প্রবোধ সান্যালের। তাই বুঝি তাঁর কলমে ভ্রমণকাহিনী খোলে বেশী ? দেশভ্রমণের বর্ণনা উপন্যাসের মাদকতা ধারণ করে ? বন্ধনহীন জীবন, অনির্দ্দিষ্ট পথচলাই ছিল তাঁর। ঢাকুরিয়ার বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অথবা মিত্র ও ঘোষের সফল উপন্যাসকার, (যাঁর বই বহুসংখ্যক লেখা ও বিক্রয় হয়) অথবা খ্যাতিমান সিনেমা-লেখক হিসাবে দেখলে যেন খর্ব্ব লাগে। বারে বারে হয়তো প্রবোধবাবুর জীবনে তাই হয়েছে। প্রাণস্রোত যে পথে চলেছে, সে পথে compromise তিনি করেছেন কখনও ইচ্ছায়, কখনও বাধ্য হয়ে। তাই বঞ্চিত বাসনা যে রচনায় নিয়েছে ছন্নছাড়া উদ্দামরূপ। ফলে রচনা কখনো অস্পষ্ট, কখনো eccentric হয়েছে। সংহতি বা পূর্ণবিকাশ পেয়েছি কম।

এই প্রবোধ সান্যাল! শিল্পীর মত চঞ্চল, আবেশবিহ্বল। কিন্তু নিজেকে অন্যরূপ দেবার চেষ্টা আছে তাঁর। তাই অভিনয় করে যান তিনি অজ্ঞাতসারে। তাই সামান্য কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতে বিভিন্নরূপ দেখেছি প্রতিবার। তাঁর অভিনেতা-মুখ ধরা পড়েছে গৌরীশঙ্কর ভটাচার্যের শ্যেনদৃষ্টি-ক্যামেরায়। অভিনয়ে আপত্তি নেই—"Life is a stage." কিন্তু প্রবোধবাবু নিজের সঙ্গেই অভিনয় করছেন। 'জলকল্লোলে' শেষ পৃষ্ঠায় আছে "নৌকা ভাসিয়েই চলেছি—মনের মতন ঘাট আজো আমি খুঁজে পাইনি।" মনের মতন ঘাট তাঁর কি, সে বিষয়ে ধারণা তাঁর কতটা স্পষ্ট ?

জীবনের বাঁকে বাঁকে খুঁজেছেন পথ, কলমের টানে টানে চেয়েছেন নূতনত্ব। সংহত জীবন-দর্শন কোথায়?

'জলকল্লোল' পড়তে পড়তে প্রথমে অভিভূত হয়ে যাই। মনে হয়, এত কবিত্বময় ভাষা, অনুভূতির তীব্রতা কি করে সম্ভব হ'ল? অবনীন্দ্রনাথের গদ্য ভাষা শুধু এর সঙ্গে তুলনীয়।

"আমার চুল উড়ছে, কাপড় উড়ছে, উড়ছে প্রাণ, উড়ছে সকল সত্তা। তরঙ্গের করুণার উপরে ছেড়ে দিতে হবে আমার এই আনন্দময় মোহময় প্রাণ! যদি অকূলে নিয়ে যায়, যদি ধরে রাখতে না পারা যায়? যদি তলিয়ে যাই, যদি কিছু খুঁজে না পাই? কত লোক যাবে নৌকায় এপার থেকে ওপারে। শুধু পারাপার, শুধু পারাবার।"

এ-ধরণের অজস্র 'purple patches' পাওয়া যাবে বইখানিতে। চোখের সামনের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে দেখালাম। শব্দযোজনায় কবিত্বের আবেগ 'জলকল্লোলে'র ভাষাভঙ্গির প্রাণ। ভঙ্গিটি বিশ্লেষণ করলে যে যে বিভিন্ন উপাদান পাওয়া যাবে, তন্মধ্যে প্রধানতম কবিত্ব। ভাষা ও লিখনভঙ্গির মধ্যে বিশদ প্রকট, দৃষ্টিভঙ্গিতেও কিয়ৎপরিমাণে। দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান উপাদান দার্শনিকতা। প্রবোধবাবুর অধিকাংশ পুস্তকে দার্শনিকতার বহুল সমাবেশ দেখি। কখনও বা আত্মার গৈরিকে অনুলিপ্ত হ'লেও ধারকরা যোগিয়া বসনের অভাব নেই। অবশ্য ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে যেটুকু দর্শন, সেটুকু খাঁটী বলেই মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, প্রবোধবাবুর চরিত্রে আত্মদর্শনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু অন্বেষণ সর্বদা লক্ষ্য পথে চলেনি। বারে বারে ভ্রষ্ট হয়েছে। পূর্বেই এ কথা বলেছি। তাই শুধু নিজের সম্পর্কে বা নিজের অতি সন্নিকট সম্পর্কে যে তথ্য প্রচার, কখনও তাই আশ্চর্যরূপে উজ্জ্বল হয়েছে; যথা:

"দোহাই স্বাচ্ছন্দ্যের আশা ক'রো না। সুখের অসহনীয় যন্ত্রণায় এই জলযাত্রা ভরিয়ে তুলো না। অভিজাত তুমি নও, তুমি এদেরই একজন। চেয়ে দেখো এই খালের জলে তোমার নিজের প্রতিচ্ছায়া। ধনাঢ্যের সমাজে তোমার ঠাঁই নেই, সেখানে তুমি উপেক্ষিত। এদের জীবনের সঙ্গে তোমার সংশ্রব নেই, এদের কাছে তুমি অপরিচিত।... তুমি মধ্যবিত্ত, ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা তোমার, তুমি আকাশের নও, মাটীর নও।"......ইত্যাদি (পৃঃ ৪৮)

এরকম উজ্জ্বল সত্যোপলব্ধি মাঝে মাঝে পেয়ে চমৎকৃত হই। চতুষ্পার্শ্বের আবহাওয়া অথবা অন্তরঙ্গের চরিত্রদর্শনে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান পাই। কিন্তু, বৃহত্তব প্রচেষ্টার মধ্যে বিলীন হযে যায় না এ সত্যসন্ধান।

ভঙ্গি-বিহ্বল ভাষা, কখনও বেপবোয়া উক্তিব প্রাদুর্ভাব—"আমরা চলেছি তাদের মৎস্য-বিলাসেব ক্ষুধা মেটাবাব জন্য,—আমরা মৎস্যগন্ধের দল।" (পৃঃ ৫৮)

মৎস্যগন্ধার analogy-র কি ব্যর্থ-প্রয়োগ !

প্রবোধবাবুর ভাষাভঙ্গির আর একটি উপজীব্য হিউমাব। "সেখানকার মেছোঘাটে লম্বা লম্বা কুমীর এসে সেজমাসীমার জন্য ওঁৎ পেতে থাকে, সে দেশ নাকি দুমুখো সাপে ভরা।...জন্তুরা অন্ধকার রাত্রে চুঁচুড়ার পথে আসে, তাদের একমাত্র লক্ষ্য—সেজমাসিমা।"

"নিজের দেহে কবে বিকার দেখা দিয়েছে বুঝতে পারিনি। আমার আঙ্গুলগুলো হয়ে উঠেছে ল্যাটা মাছের মতো, চোখ দুটো যেন বাটামাছের মরা চোখ, চুলগুলো বাগদা চিংড়ির দাঁড়া, চেহারাটা

ভেটকী মাছের মতো কুঁজো, আর পা দুখানা যেন কাঁকড়ার মতো—"

'জলকল্লোলে'র ভাষার পশ্চাতে প্রবোধবাবুকেই দেখা যায়, ভঙ্গির বিন্যাসে লেখকের চরিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। লেখক সহিষ্ণু—অন্যের দোষ, ত্রুটী, দুর্বলতা চোখে পড়েছে তাঁর, কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিচলিত ন'ন। হাস্যমুখে খোঁচা দিচ্ছেন, কিন্তু প্রহার করতে চান না। তার মধ্যে অনুভূতির উত্তাপ আছে, প্যাশন নেই। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি পর্য্যটক, সংস্কারক নন। তাই পাঠককে তিনি দিতে পেরেছেন সস্নেহ মৃদু উত্তাপ, অসহ অনল-পীড়ন নয়।

খণ্ড-বিচ্ছিন্ন জলকল্লোলের স্মৃতির মধ্যে ৬৮ পৃঃ থেকে ১৫৮ পৃঃ ব্যয়িত হয়েছে বর্ম্মা গমন বর্ণনায়। জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়টিকে অমর করে তুলবার প্রচেষ্টা স্বাভাবিক। কথাশিল্পীর কলমে ফুটেছেও ভাল। কিন্তু সত্যই অধ্যায়টির সমস্ত বইটিকে আত্মসাৎ করবার উদ্যোগে পরিলক্ষিত হয়। ভারসাম্য ব্যাহত করে এ অধ্যায় কেন এত প্রাধান্য পেল? পাঠকের কাছে বাদার মৎস্য-ব্যবসায়ের অধ্যায় তো কম কৌতূহলপ্রদ নয়।

কিছু পরে আসে নারী-অধ্যায়—কয়েকটি রমণীর কাহিনী—জলকল্লোলে গ্রথিত। দুঃখের বিষয় তারা চেনা—বড় চেনা। লেখক যতবার দেখেছেন তাদের, তদপেক্ষা অধিকবার হয়তো বর্ণনা করেছেন। গিরিবালা, টুনু, আনু, সকলেই আমাদের পরিচিত। এমন কি, অসাধারণ 'সাধু'কেও দেখেছি। শরৎচন্দ্রের নায়িকার মধ্যে পাই বৈধব্যের বাহুল্য, প্রবোধ সান্যালের নায়িকার মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণতা। ধর্ম্ম ও অবৈধ আসক্তিকে মণিকাঞ্চনের মত একসূত্রে গেঁথে কণ্ঠে তারা অনায়াসে ধারণ করেছে। ঈশ্বরের জন্য তাদের যতটা ব্যাকুলতা, আবার প্রেমিক-পুরুষের জন্যও প্রায় ততটাই।

নিজেরা অনেক সময় ধরা না দিলেও ধরে রাখতে আপত্তি নেই।

মনোবিদ্যায় বা সামাজিক আচারে এই রমণী-মণ্ডলিকে বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু প্রবোধবাবুর কৃতিত্ব, তিনি অসাধারণ তুলি দিয়ে সাধারণকে চিত্রিত করেছেন, রেখেছেন দুর্ভেদ্য রহস্য-যবনিকার অন্তরালে। জন্ম-রোমান্টিক তিনি। সেইখানেই সাফল্য তাঁর। 'জলকল্লোলে' প্রধানতঃ পাই সেই রোমান্টিক মনের সাক্ষাৎ। শুধু নারী-চিত্রণে নয়—ছত্রে ছত্রে। গোলদীঘি থেকে বঙ্গোপসাগরের কূলে কূলে এক অশান্ত মন ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়িয়েছে গোপন আকর্ষণের হেতু। কখনও দিদিমার মুখে গঙ্গাস্তোত্র, কখনও জলের ধারে প্রেমিকার সাক্ষাৎ, ইত্যাদি হেতু ধরে মন মীমাংসা করতে চেয়েছে জীবনে জলকল্লোল কেন? এ কেন'র সন্তোষজনক উত্তর তিনি পাননি, জীবনের উদ্দেশ যেমন পাননি অনেকক্ষেত্রে। ঘর থেকে বাহিরে গেছেন বারে বারে। কিন্তু তুচ্ছ আসক্তির টানে আবার ঘরেই ফিরে এসেছেন। 'জলকল্লোল' সেই ব্যক্তিটির জীবন-কাহিনী, যাঁর নিজের সঙ্গে এখনও বোঝাপড়া হয়নি।

'জলকল্লোল' ইঙ্গিত দেয় সুদূর পারাবারের, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিয়ে আসে গোলদিঘীর পাড়ে। অভিনব পরিকল্পনা, অভিনব বিন্যাস-ভঙ্গি শেষ হয়ে যায় বিশেষ কিছু না বলেই। সম্পূর্ণ বইখানি পড়ে মনে হয়, কিছু পেলাম না তো।

এই বিভ্রাট প্রবোধবাবুর রচনায় অনেকবার ঘটে। নিজের মধ্যেও যে সুদূরের ইঙ্গিত দেন তিনি, কাছে এসে দেখা যায় সে আলোক আলেয়া মাত্র। ছোটর মধ্যে আত্মহারা স্রষ্টা বৃহৎকে ভুলে থাকেন বেশ। জলকল্লোলে ক্ষীণ মর্ম্মর পাই, জলধির গর্জন শুনি না।

অথচ লেখকের হাতে কি চমৎকার তাসই না ছিল খেলার গোড়ায়।

প্রবোধবাবু আজ নিজে পারাবারের যাত্রা শেষ করে ঢাকুরিয়া-লেকের ধারে complacent হয়েছেন। উন্নতির শত্রু আত্মতৃপ্তি এসে গেছে। কিন্তু, তাঁরই ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়—"তোমাকে ওই কাশীর ঘাটে গিয়ে বসতে হ'বে।...তারপর আরও যাও এগিয়ে" (পৃঃ ১১৭)। তাঁর পথ যে শেষ হয়ে গেল, অনুরাগী পাঠকের এ আক্ষেপ ভুলবার নয়। এখানে বক্তব্য যে সমালোচনা কেবলমাত্র 'জলকল্লোলে' প্রযুজ্য, 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র লেখক অন্য ব্যক্তি।

'জল-কল্লোলের' সমালোচনার এত কথা বলবার প্রধান কারণ এই বই ইতিকথা নয়, লেখকের জীবনেতিহাস। এ পুস্তকের সমালোচনা পুস্তককারকে বাদ দিয়ে কি করে হ'তে পারে ?

তাছাড়া, 'জল-কল্লোলের' সমালোচনার সুযোগে আজ আমাদের একটি প্রকাণ্ড ক্ষোভ ব্যক্ত করছি। আজ আমাদের সাহিত্য আর চলিষ্ণু নয়—ক্ষয়িষ্ণু। আমাদের স্বনামধন্য সাহিত্যিকেরা যুদ্ধ-বাজারে পুস্তক বিক্রয়ের অঙ্কে লাভবান হয়ে ধরে নিয়েছেন সাফল্য করতলগত। তাইতো যাঁদের লেখনীতে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি ছিল, তাঁরাও আত্ম-বিস্মৃত হয়ে তলিয়ে গেছেন আপাত-সাফল্যের চোরাবালিতে। যে কোন বড় সৃষ্টির প্রথম জন্মভূমি হৃদয়—এ কথা কয়জন স্মরণ রাখেন ?

'জলকল্লোলে'র বহু সংস্করণ হয়ে গেছে, বইখানি আমাদের ভাল লেগেছে। বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে অভিনব সৃষ্টি 'জল-কল্লোল'। এ কথা যথেষ্ট নয়। বইটির কতবড় সম্ভাবনা

ছিল, কিন্তু আবার প্রতিবার অপমৃত্যু ঘটল—কতবার প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে—এটাই আক্ষেপসহ বিবেচনার বিষয়। কেন প্রবোধ সান্যালের মত শক্তিমান লেখক গতানুগতিকের ছকে আত্মবিক্রয় করছেন? সে কি তাঁর জীবনে গতানুগতিকের নিশ্চেষ্টতা এসে গেছে বলে? আমাদের অন্যান্য সাহিত্যিকের মত তিনিও কি ভুলে যাবেন তাঁর লক্ষ্য ঢাকুরিয়ার লেক নয় মহাসাগর? উত্তর আজও অজানা।

বিদেশে

গাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল

যুগে যুগে সাহিত্যের লক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে করে আত্মপ্রকাশ। আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণ বিচার করলে দেখা যায়, আধুনিক সাহিত্যের রূপ শুধু সাম্প্রতিক সাহিত্যিকের দ্বারাই নয়, ভিন্ন যুগের সাহিত্যিকের মধ্যেও যদি স্বাধীন প্রগতি পাওয়া যায়, তাঁরাও আধুনিক সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত। তা ছাড়া, কেবল প্রত্যক্ষ জগৎ নয়, দূরান্তের লেখনীও যদি আমাদের যুগের সাহিত্যকে পথনির্দেশ দিতে পারে, তাহলে সেই লেখনীর মালিক আধুনিক সাহিত্যের একটি মাপকাঠি।

আজ আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন ধারার পরিপোষণ লক্ষ্য করি। অতীত থেকে আজ পর্যন্ত নারী কত ভাবে সাহিত্যের পুষ্টি বিধান ক'রে গেছেন, আমরা চেয়ে চেয়ে দেখি। শ্রীমতী গাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল এমনি একজন সাহিত্যিকা।

নোবেল-লরিয়েটের ইতিহাসে অনেক মহিলার নাম নেই। নোবেল-প্রাইজ-কমিটী কম নারী লেখিকাকেই সাহিত্যের এই সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছেন, তবু মাঝে মাঝে যে সমস্ত নারী পুরুষ-সাহিত্যিকের চিরায়ত্ত এই পুরস্কার লাভ করেছেন, শ্রদ্ধায় তাঁদের নাম স্মরণ করি। স্মরণের মণিকোঠায় উজ্জ্বল সেই সব হীরকখণ্ড প্রতিভার দ্যুতিতে অন্ধকার আলোকিত ক'রে শোভমান। বারে বারে এই সকল মহীয়সী মহিলার নাম সাহিত্যপাঠক উল্লেখ করেন। যুগকে অতিক্রম ক'রে তাঁদের প্রতিভা আমাদের যুগকে স্পর্শ করে। সাহিত্যের চরম সার্থকতা সেখানে।

১৯৪৫ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান গাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল। শ্রীমতী মিস্ট্রালের কিছু পরিচয় প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন। গাব্রিয়েলা মিস্ট্রালের প্রকৃত নাম লুসিলা গডয় আলকেয়াগা। তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী চিলি দেশে জন্মগ্রহণ করেন।

লুসিলার বাবা ছিলেন গ্রাম্য স্কুল-মাষ্টার। তিনি মাঝে মাঝে কাব্য-চর্চা করতেন। কবিতা লেখায় তাঁর ঝোঁক ছিল। চলনসই কবিতা লিখতে পারতেন তিনি। বাবার কাছ থেকে সাহিত্যপ্রীতি, কবিত্ব-শক্তি ও পাণ্ডিত্য লুসিলা হয়তো জন্মস্বত্বরূপে পান। কিন্তু বিশেষ কিছুই আর কন্যা জনকের কাছে লাভ করলেন না। কারণ, হঠাৎ লুসিলার তিন বছর বয়সে পিতা নিজের দেশ ও নিজের পরিবার ত্যাগ ক'রে নিরুদ্দেশ হ'লেন।

তবু, অন্তর্হিত জনকের ক্ষুদ্র প্রতিভাই লুসিলার বৃহত্তর প্রতিভাকে অনুপ্রেরণা দিল। পনেরো বছরের লুসিলা একদিন পিতার লেখা কতকগুলো কবিতা হাতে পেলেন। তখন থেকেই তাঁর মনে লেখার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। তিনি লেখিকা হ'লেন।

তাঁর প্রথম লেখা অবশ্য গদ্যরচনা। ছোট ছোট চিত্র তিনি লিখে স্থানীয় সাময়িকীতে প্রকাশ করতেন। এই সময়ে তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তিনি শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলে নিয়েছিলেন। রচনায় অপরিসীম সাফল্য আসার পরেও তিনি শিক্ষাব্রতী ছিলেন। চিলির শিক্ষাবিভাগে শ্রীমতী মিস্ট্রাল বহু দায়িত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে ছিলেন বহুদিন। তিনি মেক্সিকোতে দুই বছর দেশছাড়া হয়ে ছিলেন এই শিক্ষাব্রতের জন্যই। লীগ্ অফ্ নেশনের একটি কমিটীতে লুসিলা তাঁর দেশের প্রতিনিধি ছিলেন, এ ছাড়া যুদ্ধের সময় তিনি চিলির কন্সালের অফিসের দায়িত্বে

ব্রেজিল, স্পেন ও আর্জেন্টিনায় কাজ করেন। শ্রীমতী মিস্ট্রালের জীবনীই একমাত্র আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। আধুনিক সাহিত্যে তাঁর দান কতটুকু, সেটাই প্রধান কথা। তবু লেখিকার অপরিহার্য জীবনী সাহিত্যসমালোচনায় কিছু প্রয়োজন হয় নিশ্চয়। জানার প্রয়োজন হয়, শিল্পীর মনের গভীরে কোন্ চোরাস্রোত বালি ক্ষয় করে আনে, শিল্পীর তুলির রেখায় কোন্ বর্ণপ্রলেপ পড়ে। সব কিছুই শিল্প-সৃষ্টিকে বুঝতে সাহায্য করে। প্রয়োজন হয় জানার, কবির মনের অকথিত গোপন কথাটি কি।

গাব্রিয়েলা মিস্ট্রাল, এই নামে অভিহিত লুসিলার জীবননাটকে ছায়া পড়েছিল মৃত্যুর। যে ব্যথা তাঁকে সাফল্য এনে দিল, সেই বেদনাই যে তাঁর প্রিয়কে দূরে সরিয়ে নেবার ব্যথা। প্রথম বই তিনি প্রকাশ করলেন কবিতায়—মৃত্যুর পাদপীঠে অমর প্রেমের জয়গীতি—'Sonnets of Death'; এই কাব্যগ্রন্থখানি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী মিস্ট্রাল বিদগ্ধজনমধ্যে সমাদৃতা হ'লেন, সাধারণ্যে পরিচিতা হলেন। ধীরে ধীরে তিনি লেখিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হ'লেন।

শ্রীমতী মিস্ট্রালের তরুণ জীবনে মৃত্যু গভীর আঘাত করেছিল। তিনি একজনকে ভালবাসতেন। সে তরুণ হঠাৎ আত্মহত্যা করেন। শ্রীমতী মিস্ট্রাল তাঁর বাগ্‌দত্তা পত্নী ছিলেন। কিন্তু ভাবী স্বামী যে কাজ করতেন, সেই কার্যোচিত কোন কঠিন পরিস্থিতি এড়াবার জন্যই নাকি লুসিলার প্রণয়ী আত্মহত্যা করেন। একটি নারী আজীবন শোকার্তা হ'য়ে রইল, একটি ঘর বাঁধা হল না। কিন্তু আমরা পেলাম 'Sonnets of Death', আমরা পেলাম নোবেল-লরিয়েটকে। ভাগ্য এমনি আঘাত দিয়ে তবে সোনা ফলায়। ঈশ্বর ব্যথা দিয়ে গান গাইতে শেখান।

শ্রীমতী মিস্ট্রালের সাহিত্যধারা বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় প্রকট ধর্মবিশ্বাস। অতি গভীর সেই সহজ বিশ্বাস। প্রায় সব কবিতায় বিলাপমথিত দীর্ঘশ্বাস ছত্রে ছত্রে বেজে ওঠে। তবে, শিশুদের নিয়ে যে সব কবিতা লেখা হয়েছে, সেগুলি দুঃখমূলক নয়। তিনি যে শিক্ষাব্রতী ছিলেন, গ্রামের স্কুলে তিনি যে শিশুদের গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেটা বেশ বোঝা যায় তাঁর শিশুদের বিষয়ে লেখা গদ্য রচনা বা কবিতা থেকে। 'To the Children' নামক তাঁর একটি কাব্যিক গদ্যাংশে দেখি—

অনেক বছর পরে যখন আমি নিশ্চল ধূলোর স্তূপ হয়ে যাবো, তখন তুমি আমার সঙ্গে খেলা কোরো—খেলা কোরো, আমার হৃদয়, আমার অস্থিমজ্জার ধূলো নিয়ে।—

যদি আমাকে নিয়ে কোন পুতুল গড়ো, মুহূর্তে মুহূর্তে সেই মূর্তি তুমি ভেঙে ফেলো। কারণ, অমনি করেই প্রতিমুহূর্তে শিশুরা মমতা ও বেদনা দিয়ে আমাকে বিদীর্ণ করেছে।—

ছোট অংশটির সামান্য কয়েকটি ছত্রেই লুসিলার মনের অসীম স্নেহ যেন শিশুদের ভালবাসার প্রতীক্ষা করে আছে। কোমলতা ও বেদনায় রচনাটির অনবদ্য মাধুর্য সকলকেই মুগ্ধ করে।

'Little Feet' নামক প্রসিদ্ধ কবিতায় শ্রীমতী মিস্ট্রাল করুণ স্নেহে দরিদ্র শিশুদের নগ্ন পদতলের জন্য আক্ষেপ করেছেন—

"O Tiny feet of children,
Blue with cold, unshod!
How can they see, nor cover you—
O God! * * * *
* * * * Two little suffering jewels,
Doomed to a bitter lot!
How can the people pass you by
And see you not?"

হায়, ছোট শিশুদের নগ্ন, শীতার্ত ছোট পা দু'খানি! লোকে তোমাদের দেখে যায়, তবু তোমাদের আবৃত করে না! ছোট ছোট পাগুলি রাস্তার কাঁকরে, কাঁটায় আঘাত পায়। তাদের জুতো মোজা নেই তাই শীতের তুষারে তারা জমে যায়। অজ্ঞান মানুষ এদের মূল্য দেয় না—কিন্তু যেখানেই ছোট ছোট পাগুলি স্পর্শ করে, সেখানেই আলোর ফুল ফুটে ওঠে। মানুষ কেন দেখেও দেখে না, কচি পা দু'খানি নগ্ন থাকায় কত কষ্ট পাচ্ছে তারা?—

এখানে শ্রীমতী মিস্ট্রালের লেখায় গভীর কোমলতার সন্ধান পাই আমরা। লেখিকা বিভিন্ন আঙ্গিকে লিখে গেছেন। কবিতা ও গদ্যে তাঁর সমান দক্ষতা। ছন্দোবদ্ধ কবিতা অথবা কবিতার আধুনিক গদ্যরূপ দুই আঙ্গিকেই শ্রীমতীর কাব্যসাধনা সার্থক হয়েছিল। প্রখর মনীষা ছিল তাঁর, ছিল পাণ্ডিত্য। তাঁর জীবন-ব্যাপী কর্মক্ষেত্র দেখে সহজেই অনুমান করা যায় একথা। কিন্তু মস্তিষ্কের জটিল বুদ্ধির আবর্তে কবির সহজ কোমল অনুভূতি তিনি কোথাও বিসর্জন দেননি। আধুনিক সাহিত্যের কোন কোন অংশে যে মমতাবোধ পাওয়া যায়, তার চরম পরিণতি গাব্রিয়েলা মিস্ট্রালের রচনা। যে নারী পুরুষের কাজ করে গেছেন, যে নারীর ছিল ধীশক্তি প্রখর, তিনি কিন্তু রচনায় কখনও নিজের নারীত্ব হারিয়ে ফেলেননি। একটি সকাতর করুণ, ব্যথাবিধুর নারীর মন সর্বত্র আমরা খুঁজে পাই, খুঁজে পাই একজনকে, যাঁর জীবনের বিয়োগান্ত নাটক বিশ্বের সমস্ত বেদনা তাঁর মনে এনে দিয়েছিল। তাঁর নিজের হতাশা তাঁকে কঠিন করেনি, করেছিল কোমল। সকল ব্যথায় সহানুভূতি ছিল তাঁর কাছে। আধুনিক সাহিত্যে এখানেই গাব্রিয়েলা মিস্ট্রালের দান। আধুনিক সাহিত্য বাগ্‌বিস্তার পছন্দ করে না। শ্রীমতী মিস্ট্রালের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর বাক্যসংযম। অল্প কথায় অনেক বলা তাঁর শিল্পচাতুর্য।

ছবি আঁকা কঠিন, কিন্তু এত অল্প বংএ ছবি আঁকা আরও কঠিন শিল্পকর্ম। রচনার মাধুর্য ও কোমল সহানুভূতি, একটি আদর্শবাদী মন, সংস্কৃতিশালী পবিমণ্ডল, সহজ সাদা কথায় প্রকাশিত হয়েছে। বিনা সজ্জায় রূপেব বিকাশ। আধুনিক সাহিত্যেব একটি লক্ষণও এই।

আধুনিক সাহিত্যে নাবী অথবা শ্রীমতী মিষ্ট্রালেব দান আলোচনা করতে গেলে শ্রীমতীর বচনায যুগলক্ষণ বিচাব করা আবশ্যক হ'যে ওঠে।

সাহস ও সাহসেব অকপট প্রকাশ আধুনিক সাহিত্যেব লক্ষণ আব একটি। একজন পুরুষেব পক্ষে সে সাহস স্বাভাবিক, কিন্তু, যে কোন দেশেই হোক, একজন মেয়েব পক্ষে সে সাহস দুর্লভ। শ্রীমতী মিষ্ট্রাল তাঁব প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'Sonnets of Death'এ সেই সাহস দেখিয়েছেন। তিনি ভালবেসেছিলেন। স্বাভাবিক মহিমায তিনি স্বীকার করে গেছেন। মৃত্যু প্রিযকে দূরে নিযে গেছে, তবু স্মৃতি অমব করেছে প্রেমকে। মৃত্যুঞ্জয়ী সে প্রেম। শ্রীমতী মিষ্ট্রাল জীবনে বঞ্চিত হয়েছেন, হতাশা তাঁকে গ্রাস কবেছিল। তবু তাঁব গভীর ধর্ম-বিশ্বাস কোথাও ব্যাহত হযনি। আজ মানুষ বাইবেব জগতে আঘাত পেয়ে আবাব ধীবে ধীরে ধর্মেব দিকেই মুখ ফেরাতে চাইছে। সেই ধর্মকে সাহিত্যেব মাধ্যমে এনে দিলেন শ্রীমতী মিষ্ট্রাল। মনে হয়, সাহসেব সঙ্গে এমন আত্ম-সমর্পণ, হতাশাব মধ্যে এমন বিশ্বাস, মনীষার পিছনে এমন কোমলতা—সাহিত্যে সম্ভব একমাত্র নারীর লেখনী দ্বারা। শ্রীমতী মিষ্ট্রালেব অবদান আধুনিক সাহিত্যে এখানেই। নোবেল-লবিয়েটেব জয়মুকুট তাঁব মত মহিলাকেই মানায়। শ্রীমতী মিষ্ট্রালেব 'Sonnets of Death' থেকে উদ্ধৃত করা যাক—

কঠিন বলবে তাকে? হে ঈশ্বব, ভুলে তুমি যাবে আমার সমস্ত প্রেম আমি তাকে দিয়েছি কখন? ক্ষত মন—সবি তার; চোখে জল তার প্রেম আনে! হয় হোক—জেনো তুমি এ প্রেমের স্থিব লক্ষ্য সেই একজন। (প্রার্থনা)

প্রেমিকের আত্মহত্যার জন্য ঈশ্বরের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। বেদনার মধ্যে এমন ধর্মবিশ্বাস, প্রেমের মধ্যে এমন মমতা দুর্লভ সৃষ্টি। প্রতি মুহূর্ত নিজের ব্যথা থেকে সৃজন হচ্ছে মহৎ বেদনাবোধ সকলের জন্য। গভীর বেদনার সমুদ্রে জন্ম নিল মুক্তা। সাহিত্যের মাধ্যমে এমন আত্মদর্শন নারীকেই শোভা পায়। তার মনের তাবে যে বড় কোমল সুর বাজে। নিজের মধ্য থেকে বহির্জগতে ব্যাপ্তি নাবীমনের ধর্ম। অন্যের ব্যথায় তার কাঁদা চাই। নিজের ব্যথা তার সাধনার প্রথম সোপান।

গাব্রিয়েলা মিস্ত্রালেব সাহিত্যসাধনা সার্থক—তিনি সাহিত্যকে নারীত্ব দিয়ে স্পর্শ কবেছিলেন। বিশ্বজনীন আবেদনের পিছনে ছিল লুসিলা,—ছিলেন শ্রীমতী মিস্ত্রাল নিজে।

ক্যারোলিন ও সাদে

ইংরাজী সাহিত্যে রবার্ট সাদের নাম নানা কারণে বিখ্যাত। যদিও বর্তমান সাদের কাব্যে যথেষ্ট আস্থা রাখেনা, তবুও যে কোন ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে সাদের নাম পাওয়া যাবে, যে কোন কাব্যসঞ্চয়নে অন্ততঃ তাঁর একটি কবিতাও অন্তর্ভূক্ত হ'তে পারে। তিনি লবিয়েট কবি হয়েছিলেন। কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কবি কোলরিজের সঙ্গে তাঁব নাম উল্লেখিত হয় বাবে বারে; কাবণ, ইংলণ্ডের আকাশে যে নূতন আলোব দেখা পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে, সে আলোর পথপ্রদর্শক ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে কবি সাদে অন্যতম।

অসংখ্য পুস্তক সাদে রচনা করে গিয়েছিলেন। তাঁর মত অজস্র রচনা কম লেখকই দিতে পারেন। গদ্য ও কাব্যে উভয়েতেই সুনিপুণ হাত ছিল সাদের। দীর্ঘ জীবন তিনি কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করে গিয়েছেন এক মনে। কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে তাঁর মানস-লক্ষ্মী কে ছিল, জানবার পূর্বে সাদের জীবনেতিহাস জেনে নেওয়া যাক।

ব্রিষ্টল শহরে ১৭৭৪ সালে সাদের জন্ম হয়। পিতা কাপড়ের ব্যবসা করলেও মাতা ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা। সুতরাং সাদের এক মাসীকে আমরা পাই বাথ শহরের স্বচ্ছল নাগরিকারূপে। সাদের শৈশবের পটভূমিকায় সংস্কৃতির ছাপ পড়েছিল। তিনি মাসীমার বাড়ীতেই দিন কাটাতেন। ওই বাল্যবয়স থেকেই সাদের ভাবগতিক একটু বিশেষ ভাবের লক্ষিত হো'ত। ব্রিষ্টল বা বাথ শহরে নামজাদা কোন অভিনেতা পা দেওয়া মাত্র সাদে তাঁর

পশ্চাৎধাবন করতেন। তাঁর মনে ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, হয় নাটকের অভিনেতা অথবা নাটকরচয়িতা, এই দুইএর এক হ'তে না পারলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সাদের এই পরিচয়টুকু মূল্যবান—তাঁর কবিতায় যে সমস্ত নাটকীয় উপাদান আছে, তার উৎপত্তি শিশুকালেই। মাসীমার প্রভাব ও মাসীমার সহায়তা তাঁকে জীবনের মধুর দিকটাই দেখিয়েছিল। লেখা পড়ায় সাদে উৎকৃষ্ট ছিলেন না। ছেলেবেলায় তিনি ছোট পাড়াগাঁ স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। ফলে, গ্রীক, রোমান সাহিত্য তাঁর পড়া ঘটেনি—ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি তিনি। চোদ্দ বছর বয়সে তিনি অবশ্য 'ওয়েষ্ট মিনিষ্টার' শিক্ষায়তনে ভর্তি হ'ন।

সাদের চরিত্রের একটি দিক এই সময়ে পাওয়া যায়, তাঁর রাজনীতির দিকে ঝোঁক ও বিদ্রোহী মন। বেত্রাঘাতের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখার ফলে সাদে কলেজ থেকে বহিস্কৃত হন। ব্যালিওল ও শেষে অক্সফোর্ড কলেজে তিনি পাঠ শেষ করেন। ফরাসী বিদ্রোহের অগ্নিকণিকা শিরায় শিরায় বহন করে সাদে 'জোয়ান অফ আর্কের' জীবনী লিখতে আরম্ভ করেন বিদ্রোহমূলক মহাকাব্য আকারে, (১৭৯৩)। তাঁর জীবনে বিদ্রোহের সুর এইভাবেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

অক্সফোর্ডে পাঠ্যাবস্থায় কোলরিজের সঙ্গে সাদের বন্ধুত্ব হ'ল। সাদের মানসিক অবস্থা তখন অত্যন্ত বিভ্রান্ত ছিল। ফরাসী বিদ্রোহের সুর তাঁর মনে প্রাণে ঝঙ্কৃত হয়ে সহজ পথ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করছিল। মানসিক অপ্রকৃতস্থার লক্ষণ এই সময়ে দেখা দিল সাদের অত্যধিক নৈরাশ্যের ফলে। তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা পাই আমরা এখানেই।

কোলরিজ নিজের রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদে সাদেকে দীক্ষিত করলেন। সাদের মানসিক বিপর্যয় প্রশমিত হ'ল, কিন্তু তিনি ডিগ্রী নেবার আগেই অক্সফোর্ড ছেড়ে ব্রিষ্টলে ফিরে গেলেন।

এবার সাদের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হ'ল, তাঁর প্রেম জীবন। ক্যারোলিন নয়—শ্রীমতী ঈডিথ ফ্রিকার। উভয়ে বাগদত্ত হ'লেন। কিন্তু কোলরিজেব বাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণের ফলে সাদের মাসীমা তাঁকে ত্যাগ করলেন। সাদেব ইতিপূর্বে ১৭৯৫ সালে ছোট একটি কবিতার বই বার হয়েছিল। অধ্যাপনা ও সাহিত্য সেবা নিয়ে প্রায় অনাহাবে সাদের দিন কাটছিল। অবশেষে বাধ্য হয়ে তিনি মায়েব কাছে থাকতে এলেন। নানা কারণে সাদেকে ব্যক্তিগত মতবাদ সাময়িক ভাবে ত্যাগ করে পর্টুগালএ চলে যেতে হ'ল। কিন্তু যাত্রার দিন সকালে তিনি ঈডিথ ফ্রিকারকে বিবাহ করেন অতি অনাড়ম্বব ভাবে গির্জাব শান্ত পবিবেশেব আবহাওয়ায।

ইংলণ্ডে ফিরে আসবার পবে সাদে সম্পূর্ণ ভাবে সাহিত্যে আত্মনিযোগ করলেন। কিন্তু, দারিদ্র তাঁব ঘুচল না। তাবপরে দীর্ঘ কতকগুলি বৎসর সাদে পত্নী ঈডিথেব সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘোবাঘুবি কবে অবশেষে নানা বিপর্যয়েব পরে কেস্‌উইক-এ স্থায়ী ভাবে বাস করতে আরম্ভ করলেন। তাবপবের চল্লিশ বৎসব যাবৎ তাঁব গৃহ হ'ল কেসউইক।

সাদের বহুসংখ্যা পুস্তকাবলীব তালিকা নির্মাণ প্রয়োজনীয় নয়। তবে এতক্ষণ ধরে তাঁর জীবন আলোচনা করে দেখা গেল তাঁব সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টি তাঁর নিজের জীবনের ছায়া। বিদ্রোহ, নাট্য শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ তাঁর কাব্যে প্রাণস্পন্দন ও মহাকাব্যের সুর এনেছে। গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্য না জানায় নিছক সহজ দেশের প্রাণ স্পন্দন পাই তাঁর কাব্যে।

তাছাড়া, পূর্বেই বলা হয়েছে, সাদের সময়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের গগনে নূতন আলো দেখা দিয়েছিল। সে আলো রোমান্টিক জাগরণের—সে আলো অন্যান্য অধিক খ্যাতনামা কবির সঙ্গে সঙ্গে সাদেরও মন প্রাণ আলো করেছিল।

১৮০১ সালে সাদে 'Thalaba' লেখেন, ১৮০৫ সালে 'Madoc' লেখা হয়। ১৮১০ সালে সাদের শ্রেষ্ঠ পুস্তক 'The curse of the Kehama' প্রকাশিত হয়। তিনটি কাব্যের মধ্যে 'Thalaba' আরব দেশের মহাকাব্য। 'Madoc' একজন ওয়েলসের রাজকুমারের অভিযানের ইতিহাস, 'The Curse of the Kehama' হিন্দু পুরাণের সূত্র অবলম্বনে লেখা। এ ছাড়া, কাব্যের মধ্যে 'Roderick, the past of the Goths' সমধিক প্রসিদ্ধ। দীর্ঘ, সময়ে কষ্ট-কল্পিত ও স্থানে স্থানে নীরস কাব্যগুলির অপেক্ষা ছোট কবিতা, যথা, 'The Battle of Blenheim', 'The Well of St. Keyne' ও 'The Inchcape Rock' অধিকতর খ্যাত।

সাদের কবিতার বর্তমানে যথেষ্ট আদর নেই। তবু তাঁর গদ্য বইগুলি আদৃত হয় এখনও। 'Life of Nelson', 'Life of Wesley'. 'History of Peninsular War' ইত্যাদি অসংখ্য পুস্তক সাদে গদ্যে লিখে গেছেন।

রাজনৈতিক মতবাদ পরিবর্তন করে সাদে রাজকবির পদ গ্রহণ করাতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও শ্লেষ বর্ষিত হ'তে লাগল। ১৮৩৫ সালে মন্ত্রী Peel সাদেকে ব্যারণ করতে উদ্যত হলে, অবশ্য সাদে প্রত্যাখ্যান করেন, যদিও অভাবের মধ্যে সরকারী অর্থ-সাহায্য তাঁকে নিতে হয়েছিল।

রাজকীয় অর্থসাহায্য পাবার পরে সাদের অবস্থা একটু ভাল হয়। কিন্তু ১৮৩৭ সালে তাঁর বিয়াল্লিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনের

প্রথমা স্ত্রী ঈডিথ প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর পূর্বে ঈডিথের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছিল।

এবার সুরু হ'ল সাদের জীবনের সংক্ষিপ্ত অথচ শ্রেষ্ঠ অধ্যায়—শেষ অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় তাঁর বাল্যজীবন, রচনা ও চরিত্রগঠনের সূচনা। দ্বিতীয় অধ্যায় বিবাহ ও সংসার। তৃতীয় অধ্যায় প্রেম। চোরাবালি স্রোতের নীচে থাকে সঙ্গোপনে। অদৃশ্য হ'লেও সে অতি নিশ্চিত। সহসা একদিন স্রোতের টানে আত্মপ্রকাশ করে। জীবনের বাঁকে বাঁকেও এমন অনেক গোপনীয় বস্তু আছে।

মণীষা রহস্যময়। যাকে একদা ভালবেসে বিবাহ করা যায়, যে গৃহের ঘরণী, সন্তানের মাতা হয়ে নিরবচ্ছিন্ন কাল একত্রে বাস করে, কবি অথবা শিল্পীর জীবনে প্রেরণার উৎস সে-ই হয়ে থাকেনা। যাকে শিল্পী ভালবাসেন, সে হয়তো জীবনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়।

১৮১৯ সালে সাদের সঙ্গে একজন তরুণীর পরিচয় ঘটে। তাঁরই নাম ছিল ক্যারোলিন বাওয়েলস। তিনি নিজেও কবি ছিলেন। তাই বুঝি তিনি কবির প্রাণ স্পর্শ করেছিলেন কাব্যের অঙ্গুলী দিয়ে, রক্তমাংসের হাতের স্পর্শ দিয়ে নয়। ক্যারোলিন হ্যাম্পশায়ার-বাসিনী। রাজকবি সাদের কাছে নিজের কতকগুলি কবিতা তিনি পাঠান মতামতের জন্য।

সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর উভয় পক্ষে চলে নীরব প্রেম ও হৃদয়-বিনিময়। সাদে অতি চমৎকার পত্র লিখতেন। ক্যারোলিনকে বিশ বৎসর ধরে তিনি অসংখ্য পত্র লিখে গেছেন। তার মধ্যে কিছু আমাদের হাতে পৌঁচেছে।

পত্র বলে দেয় ক্যারোলিনের প্রতি সাদের গভীর প্রেম, সাদের গুণানুরাগ; সাদের ক্যারোলিনের সঙ্গে চিরজীবন সখ্যতার অঙ্গীকার।

জানিনা মহিলা কবি ক্যারোলিন কত মহিয়সী ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজকবি সাদে তাঁকে ভালবেসেছিলেন—প্রমোদ রজনীর নর্মসঙ্গিনীর প্রতি মুহূর্তের চপল প্রেম নয়। বিশ বৎসর এ প্রেম অপেক্ষা করেছিল। তাইতো এ এতই মধুর।

অনেক শিল্পী, অনেক কবি মানসীর কাছে প্রেরণা পান। ক্ষণস্থায়ী প্রেম-অধ্যায় তাঁদের—চকিত বিজলীর মত আকাশ আলো করে মিলিয়ে যায়। কিন্তু, সাদেব কাব্য দেউলে প্রেরণার উৎস তড়িৎ-প্রভা নয়—স্থির, অচপল দীপশিখা। কবির মনের মানসী। তাঁকেই কবি চেয়েছিলেন প্রতিটি কবিতার মধ্য দিয়ে, প্রতিটি দিনের বুকে। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরে বৃদ্ধ সাদে ষাটের উপর বয়সে আর একটি বৃদ্ধার পাণিগ্রহণ করলেন। ক্যারোলিন সাদের অপেক্ষা মাত্র বার বছরের ছোট ছিলেন।

দীর্ঘ অপেক্ষার পরে বাঞ্ছিতাকে পাওয়া সাদের পক্ষে মারাত্মক আনন্দ হ'ল। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পরেই সাদের মস্তিষ্ক-বিকৃতির সূচনা দেখা দেয়। ১৮৩৯ সালে তিনি ক্যারোলিনকে বিবাহ করেন। অতি আনন্দ ও উত্তেজনায় তার পরের চার বৎসর তিনি অপ্রকৃতিস্থ জীবন যাপন করে যান। এমন কি পরিবারের কাউকে তিনি চিনতে পর্যন্ত পারতেন না। ১৮৪৩ সালে কবির জীবনান্ত ঘটল। সাদের প্রথম পক্ষের সন্তানদের দুর্ব্যবহারে বিধবা ক্যারোলিন স্বগৃহে ফিরে গেলেন। ১৮৫৪ সালে তাঁরও দেহাবসান ঘটল।

এই সাদে ও ক্যারোলিনের প্রেম উপাখ্যান। 'অতি পুরাতন বিরহ মিলন কথা' বলে একে কিন্তু চিহ্নিত করলে আমরা ভুল করব। এই দুইটি শিল্পী নরনারীর পশ্চাৎপট অসংযম নয়—আবেগের সুলভ উচ্ছ্বাস নয়—নীরব প্রতীক্ষা।

ব্যক্তিগত গীতিকবিতারচনা সাদের কবি-মানসের ধর্ম নয়। তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল দীর্ঘ কাব্যপ্রয়াসে। পড়াশোনা তিনি করতেন ক্রমাগত—পুস্তকের বাতাস তাঁর পক্ষে নিঃশ্বাস বায়ু ছিল। ক্রমাগত রচনা-কার্যে মনোসংযোগ করার ফল পাই আমরা অতগুলি কাব্য, তাঁর দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল পাই গদ্য পুস্তকগুলি।

কিন্তু ব্যক্তিগত কবিতা আমাদের হাতে আসেনা সহজে। ছোট ছোট কবিতাগুলিও বর্ণনামূলক। ক্যারোলিনের প্রভাব বা ক্যাবোলিনের প্রেরণা সাদেকে কতটা অনুপ্রেরিত করেছিল? তাহলে কি সাদের প্রেম জীবনের সাক্ষ্য তাঁর চিঠি মাত্র?

পত্রলেখায় আমরা বিশ্বাস করি না। শিল্পীর আবেশমত্ত মন নিরালা মুহূর্তে অনেক প্রেমপত্র রচনা কবে যায় অনেক সুন্দরীর উদ্দেশে। কিন্তু সাদের পত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর জীবন-দর্শন। সাদেব জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর প্রেম।

এ প্রেমের পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষায়। ধর্মপত্নীর সঙ্গে বৈচিত্র্যবিহীন দিন যাপন করে যাচ্ছেন যে পণ্ডিত লেখক, অজস্র কাজ যাঁর বিশ্রাম হরণ করে নিয়েছে, অভাব ও শত্রু যাঁর মন কণ্টকিত করে তুলেছে, তাঁরই মনের কোণে সঞ্চিত ছিল এত প্রেম! বৃদ্ধ বয়সে বয়স্ক পুত্রকন্যার সাক্ষাতে তিনি বৃদ্ধা ক্যারোলিনের পাণিপীড়ন করলেন প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। কিশোরের অধীর প্রেম নয়—তবু অধীরতা দেখে বোঝা যায় কবির ব্যাকুল প্রেমের প্রকৃত রূপ।

সাদে সারা জীবন শান্তি পাননি, পাননি তৃপ্তি। তাঁর প্রথম বিবাহ প্রেমমূলক হ'লেও প্রেমের রামধনু প্রাত্যহিক দিনের আকাশে মিলিয়ে গিয়েছিল। জীবনের শান্তি ছিল সাদের ক্যারোলিনের

ভালবাসা। ক্যারোলিনও নীরবে প্রতীক্ষা করেছিলেন। তিনি যে সাদেরই জাত—তিনিও যে কবি।

কবির দিনপঞ্জী কবির কাব্য। বর্ণনাত্মক মহাকাব্যের কাঠামোতে লেখা সুদীর্ঘ কাহিনীতে কোথায় পাই কবিকে? সেই প্রেমিক সাদেকে পাই কোথায়? অনেক বর্ণনার মধ্যে ফুটে ওঠে কবির নিজের হৃদয়, কাব্যের ছত্রে ধ া যায় কবির অসতর্ক আত্মপ্রকাশ। সাদের "Thalaba" কাব্যের কয়েকটি ছত্র দেখা যাক—

"Years of his Youth, how rapidly ye fled
In that beloved Solitude!
Is the morn fair, and doth the freshening breeze
Flow with cool current o'er his cheek?
Lo! underneath the broad-leaved Sycamore
With lids half closed, he lies,
Dreaming of days to come."

মধুর নির্জনতায় কি দ্রুত তার যৌবন কেটে গেল! প্রভাত কি মোহন রূপে দেখা দিত! স্নিগ্ধ বায়ুপ্রবাহ তার কপোলে শৈত্য স্পর্শ দিয়ে যেত কি? দেখ, প্রশস্ত পাত্র সাইকামোর বৃক্ষের নীচে অর্ধনিমীলিত নেত্রে সে শুয়ে আছে, সে অনাগত ভবিষ্যের স্বপ্নবিভোর।

এই নায়ক 'থালাবা' নয়—সাদে নিজে। ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে বর্তমানে নয়ন মুদ্রিত করে কবি ধ্যান করেছিলেন মৃত্যুর আবির্ভাবের মধ্যে চিরজয়ী প্রেমকে। অন্তিমক্ষণে সেই প্রেম তাঁর জীবনে ধরা দিল। জ্ঞানহারা কবির শেষ মুহূর্তগুলি সুধায় ভরে উঠেছিল কিনা জানিনা। শুধু জানি, সাদের প্রেরণার উৎস যখন পরিণয়ের বন্ধনে ধরা দিল, তখন সাদের জীবনে আর প্রেরণার প্রয়োজন

রইলনা। দূর থেকেই ক্যারোলিন ছিলেন প্রেরণার উৎস। কাছে এসে তিনি এত আনন্দ ও উত্তেজনা বহন করে আনলেন, যে সাদের অস্থির মন তা সহ্য করতে পারলনা। তবু তো আমরা মোহিত হই। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বিশবৎসরের প্রতীক্ষার পরে অসমাপ্ত সংক্ষিপ্ত মিলন তবু তো আমাদের বিমুগ্ধ করে রাখে।

কারণ, সাদে ছিলেন প্রেম ও প্রতিভার সংমিশ্রণ স্বপ্নাতুর 'থালাবা' কবির মানস পুত্র নয় শুধু—তার স্বপ্ন কবিরও স্বপ্ন। সুদূর ক্যারোলিন যেন কবির জীবনে একটি নিঃসঙ্গ তারকা। ওই দূর আকাশে তাঁর বাসা, কিন্তু স্নিগ্ধ দীপ্তি তাঁর কবির উপর অহোরহ বর্ষিত হত। ক্যারোলিন যেন সাদের আকাশে উজ্জ্বল শুকতারা নয়—মলিন ও মধুর সন্ধ্যাতারা। বিরামের ক্ষণ পূর্ণ করেছিলেন তিনি, আবার অন্তিমের চরম মুহূর্ত্তেও তাঁরই সকরুণ স্নেহ মুমূর্ষু কবির শিয়রে প্রহরী হয়ে ছিল। কবিকে যিনি কবি করেছিলেন, তাঁকে বন্দনা করি।

বিগত যুগের লেখক

হঠাৎ বিশেষ করে ইংরাজি ঔপন্যাসিক চার্লস্ ডিকেন্সের কথা মনে হচ্ছে। আজকাল আধুনিক নাগরিকেরা, বলা বাহুল্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই লেখকটিকে বিস্মরণের কোঠায় ঠেলে দিয়েছেন। আমরা ইংরাজি সাহিত্য ভালবাসি। শতাব্দীর অধীনতা এই প্রীতির জন্মদাত্রী, অথবা বাঙালী সাহিত্যিক মানসের প্রবণতা ইংরাজী সাহিত্যের আবহাওয়ায়, বলা শক্ত।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্যে বক্রতা নিঃসন্দেহে জটিল। তাই পড়াশোনা যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা বিংশ শতাব্দীতেই অরূপ রতনের আশায় ডুব দেন। হয়তো সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে না প্রাচীন কোন লেখকের পশ্চাদ্ধাবন। নিজের দেশের প্রাচীন ব্যক্তিদের রচনাই পাঠ করা ঘটে ওঠে না। জীবন যে বড়ই সংক্ষিপ্ত।

তবে, আমাদের মত নেশাখোর পাঠক, পুস্তকাভাবে বিজ্ঞাপন বা পঞ্জিকা যাঁদের পাঠ্য, তাঁরা জন্ম থেকেই নানা বই পড়ে বয়ে গেছেন। গোঁড়া স্কুলে বিদেশী সাহিত্যের আধুনিক বই ছিল না। ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক। সদ্য জাগ্রত ক্ষুধার তাড়নায় স্কুল জীবনেই গোগ্রাসে গিলে গিলে যাদের জীর্ণ করেছিলাম, চার্লস্ ডিকেন্স তাদের মধ্যে একজন।

আজকাল বহু পণ্ডিতের সঙ্গে কথাবার্তার সৌভাগ্য হয়। মমের তর্জমা করেন তাঁরা, এলিয়টের বিশেষত্ব সম্পর্কে আধঘন্টা নিরঙ্কুশ বক্তৃতা করতে পারেন! কিন্তু ডিকেন্স? না, না, ডিকেন্সের গোটা বই পড়ার

সময় হয়ে ওঠেনি। বড় জোর পিক্‌চারে একটা কিছু দেখেছেন। অথচ তাঁরা বয়সে আমার চেয়ে বড়। ডিকেন্সকে প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক মনে হ'বার কারণ নেই।

প্রকৃতপক্ষে, ডিকেন্স বেচারী বড়ই সেকেলে হয়ে গেছেন। যদি তাঁর অশরীরী আত্মা এখনও বাতাসে বিচরণশীল হয়ে থাকে, যদি সে আত্মা নিগার বলে ঘৃণা না করে, তাহ'লে হয়তো এতক্ষণে হাসি শুনতে পেতাম।

"সেকেলে বলছ আমাকে? বেশ! তা'হলে পাশ্চাত্য দেশে এখনও আদর যায়নি কেন? প্রমাণ, ছবিগুলো তোলা হচ্ছে না?"

"ও কথা ছাড়ুন—" আমতা আমতা করে উত্তর দেওয়া যাক—"ভাল গল্প কি আর ওরাই পাচ্ছে? পুরাণো ক্লাসিক বলে মোহ"।

"তাহ'লে তুমি-ই বা দেখতে যাও কেন? এই তো স্পষ্ট দেখলাম সেদিন 'অলিভার টুইষ্ট' দেখে একখানা রুমাল ভিজিয়ে বাড়ী ফিরলে। মাথা ধ'রে তোমার রীতিমত কষ্ট হ'ল।"

"আপনি লেখক, পাকা উকীলের মত জেরা করবেন না। বিশ্রী লাগে।"

"কি করব বল? একেবারে বাতিল বলে ঠেলে দিতে চাও যে তোমরা। অথচ জীবনের সহজ সাদা সত্যের সন্ধান পাও আমারি মধ্যে। চিরন্তন বেদনা পৃথিবীর আমার রচনায় ফুটে উঠেছে। আমি তো তোমাদের মন স্পর্শ করি। তাই তো কাঁদ।"

"যাই বলুন, অত কাঁদাকাটি ভাল লাগে না। আপনার দোষ তো ওই। আপনি যেমন মেলোড্রামাটিক, তেমনি সিরিয়াস। মৃত্যু বর্ণনা করতে পেলে আপনি কিছুই চান না, দেখেছি আমরা। 'ডম্বে অ্যাণ্ড সন্‌সে' পল মরছে, 'গ্রেট এক্সপেক্টেশনে' সেই ফেরারী কয়েদীকে কি ভাবেই আপনি হত্যা করেছেন! আপনার ওসব তৃতীয় শ্রেণী

কৌশল আমাদের কুৎসিৎ লাগে। শিশুদের মৃত্যুর বর্ণনা যেন আপনি একটু একটু করে রস গ্রহণের সঙ্গে বর্ণনা করেন। কেন? না, আমরা প'ড়ে হাউ হাউ করে কাঁদব।"

বাক্যস্রোত বাধা পেল—"শুধু তাহলে কাঁদিয়েছি? 'পিকউইক পেপার', 'স্কেচেস বাই বজ' পড়ে হেসে লুটোপুটি খাওনি? বলি, যে বইগুলোর এত নিন্দে করলে, তার মধ্যেও কতটা হাসির খোরাক পেয়েছ, শুনি?"

"তা অবশ্য আংশিক সত্য। কিন্তু, বলুন তো অনেক জায়গায় কি ভাবে জোর করে হাসাবার চেষ্টা করেছেন। চরিত্রগুলো পর্যন্ত বিকৃত হয়ে গেছে, যেন তারা জীবন্ত মানুষ নয়, তারা যেন যাত্রার সং"—

আস্তে ডিকেন্সের গলা মিলিয়ে গেল, দেখা দিল একটি মূর্তি, মোটা দাগের ওয়েষ্টকোট, সাদাটে তোবড়ানো টুপী, অথচ গলায় জড়ানো টুকটুকে লাল রুমাল।

মূর্তি ঝুঁকে পড়ল—"আমি স্যাম ভেলার।" 'Two L's, old feller', কি হাসছ যে? আমি জীবন্ত নই, না?"

ক্ষীণ কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করলাম, "তুমি একজন জুতো পালিশদার, তুমি কি বুঝবে? মিঃ জিঙ্গল লোকটা সং-এর মত নয়?"

"মোটেই না। চিরকুমারীর সঙ্গে তার প্রেম করা দেখে তোমরা কি হাসনি? মিঃ পিক্‌উইক সাধে বলেন—"

"থাম, থাম। মনিবের প্রশংসা রাখ তুমি। 'পিক্‌উইক্ পেপার'খানা ভালই হয়েছে—"

"অন্য বইও পড়েছ নাকি?" সকৌতুকে স্যাম ওয়েলার প্রশ্ন করল—আমি উত্তেজিত হয়ে এক নিশ্বাসে চার্লস ডিকেন্সের জীবনী ও পুস্তক তালিকা আউড়ে গেলাম। যে পাঠক জানেন না, তাঁর

জন্য এখানে লিখে দিচ্ছি। এত দিনের প্রাচীন লোকের ইতিবৃত্ত হয়তো আবার নূতন লাগতে পারে।

১৮১২ সালে চার্লস ডিকেন্স একজন দীন কেরানীর পুত্ররূপে Portsea-এর সন্নিকটে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা নাবিকদের বেতনবিভাগে অফিসের সামান্য সরকারী কর্মচারী ছিলেন। আটজন সন্তানের মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন চার্লস। স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল ছিল না। দিনরাত বই পড়ার অভ্যাস ছিল। এই সময়ে তাঁর মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করলে ভবিষ্যৎ জীবনের গঠন বোঝা যায় নিঃসন্দেহে। পঠনীয় বই-এর মধ্যে প্রিয় ছিল ফিলডিং, স্মলেট ও লা সেজের উপন্যাসগুলো। নাটক অভিনয়ের দিকেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল দর্শক হিসাবে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে নাটকীয় বিন্যাস পাই আমরা যথেষ্ট।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডিকেন্স পরিবার চলে এলেন লণ্ডনে। বাড়ীর কর্তার কিন্তু হ'ল অধোগতি আর্থিক অবস্থায়। সুতরাং অবশেষে ঋণীর কারাগার বা debtor's prison-এ তাঁর হ'ল গতি। বেচারী চার্লস্ একটা বিশ্রী ফ্যাক্টরীতে কাজ নিতে বাধ্য হ'লেন ওই বয়সেই। তারপরে কোনমতে তাঁর পৌনঃপুনিক ব্যাহত শিক্ষা সুরু হ'ল আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে। ১৮২৭ সালে চার্লস একজন এটর্নীর অফিসে কাজ নিলেন ও সর্টহ্যাণ্ডরচনায় হ'লেন পারদর্শী। এই কারণেই ১৮৩৫ সালে চার্লস 'Morning Chronicle' পত্রিকার রিপোর্টার হিসাবে একটি কাজ পেলেন। এই তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা। তিনি কাগজের রিপোর্টার অবস্থায় তৎকালীন ষ্টেজকোচ করে অনেকবার চলাফেরা করতেন। সেই সময়ে তাঁর লেখার উপাদান সংগৃহীত হয়। ১৮৩৩ সালে 'Monthly Magazine' পত্রে তাঁর কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। এদের একত্র

করে 'Sketches by Boz' বইখানি লেখা হয়। Sketch নামধেয় হাল্কা রচনাগুলো বহুল প্রশংসা লাভ করেছিল। ১৮৩৬ সালে 'পিকউইক পেপার' লেখা হয়—'The Posthumus Papers of Pick-wick Club'—চিত্রকরের তুলীকে অনুলিখিত করবার জন্য রচিত ছোট ছোট গল্প জাতীয় রচনা ক্ষীণ সূত্রবদ্ধ। পঁচিশ বছরে ডিকেন্স্ প্রসিদ্ধ হ'লেন।

চার্লস্ ডিকেন্সের পরবর্তী রচনার নাম একে একে—Oliver Twist (১৮৩৭), Nicholas Nickleby (১৮৩৮), The Old Curiosity Shop (১৮৪০), Barnaby Rudge (১৮৪১), American Notes (১৮৪৩), Martin Chuzzlewit (১৮৪৩), A Christmsas Carol (১৮৪৩), Dombey and Son (১৮৪৮), David Copperfield (১৮৪৯), Christmas Stories, Bleak House (১৮৫২), Child's History of England, Hard Times (১৮৫৪), Little Dorit, A Tale of Two Cities (১৮৫৯), Great Expectations (১৮৬০), Our Mutual Friends (১৮৬৪), The Mystery of Edwin Drood.

শেষ বইখানি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি। রচেষ্টারের কাছাকাছি ডিকেন্সের একখানি প্রিয় বাড়ী ছিল—Gad's Hill সেখানে তিনি মারা যান। ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবিতে তাঁর সমাধি আছে।

বইগুলির সুদীর্ঘ তালিকা দেখে বেশ বোঝা যায় ডিকেন্স কি অধ্যবসায় নিয়ে এতগুলি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর সময়ে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। আমেরিকায় তাঁর জনপ্রিয়তা ইংলণ্ডের থেকে কম ছিল না। জনপ্রিয়তাই বোধহয় অবশেষে তাঁর মৃত্যুর কারণ হ'ল। কারণ লোকের আগ্রহে কিছুদিন হ'ল ডিকেন্স (১৮৫৮)

জনসাধারণের সামনে নিজের লেখা থেকে পাঠ করতে আরম্ভ করেছিলেন। আমেরিকাতেও এই সাহিত্যপাঠের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। এখানে ডিকেন্সের জীবনে নাট্যপ্রীতির সন্ধান মেলে। জীবনীকার বলেন যে, যে অংশগুলো ডিকেন্স স্বীয় রচনা থেকে মনোনীত করতেন, সবগুলোই লেখার উৎকর্ষের জন্য যত না হয়, নাটকের অভিনয় দেখবার উদ্দেশে বাছা হ'ত। এই ধরনের সাহিত্য পাঠে ডিকেন্স টাকা পেতেন প্রচুর, কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতি হ'তে হতে শেষে তাঁর পরিশ্রম তাঁকে শেষ করে ফেলল।

সাংবাদিকতার দিকেও ডিকেন্সের অবদান আছে। তিনি 'The Daily News' পত্রের সম্পাদনা করতেন ও 'Household Worlds' ও 'All The Year Round' নামক দু'খানি সাময়িকীর প্রতিষ্ঠা করেন। সারা জীবনে বহু ভ্রমণ করেছেন তিনি। তাঁর প্রতিকৃতি দেখেছেন সকলেই—মানুষটিকে দেখলেই একটু গল্প করতে ইচ্ছা হয়। দু'দণ্ড চায়ের কাপের সঙ্গী করে নিতে বাসনা জাগে। মনে হয়, এঁর হৃদয় আছে, সেই হৃদয় সহানুভূতি ও করুণায় কোমল।

এতক্ষণ অনেক বাজে কথার পরে, ডিকেন্সের প্রকৃত মূল্য কোথায়, তার সন্ধানে এলাম। ওই দয়া, ওই সহানুভূতিটুকুই সমগ্র ডিকেন্সীয় সাহিত্যের মূলমন্ত্র। লণ্ডনের যত গ্লানির, অশিক্ষিত দরিদ্র জীবনের যত বেদনা ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে বই-এর পাতায়। জীবনের সঙ্গে কতটা যোগ রাখলে সাহিত্য জীবনধর্মী হয়ে ওঠে ডিকেন্স তার প্রমাণ। 'ডেভিড কপারফিল্ড' বইটি হয়েছে অনেকাংশে ডিকেন্সের আত্মজীবনী। ফ্যাক্টরীতে নিজের বিড়ম্বিত শৈশব, ঋণের দায়ে বাবার কারাবাস এ সমস্তই ডেভিব কপারফিল্ডের উপাদান।

সমালোচকেরা বলেন যে, ডিকেন্স নূতন কিছুই বলেন নি, কিন্তু

বলার ভঙ্গী ছিল অভূতপূর্ব। ডিকেন্স তাঁর লণ্ডনকে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন সেই দুর্লভ আলো দিয়ে—"The light that was never on the land and seas."

কিন্তু এই আলো রোমান্টিক জাগরণের আলো নয়—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার শীর্ষে প্রদীপের মত। কঠোর এবং নির্মম বাস্তববাদ মিশেছিল এর সঙ্গে। যত অনাচার, যত অন্যায় তাঁর সন্ধানী দৃষ্টির গোচরীভূত হয়েছিল। তিনি ছিলেন লণ্ডন শ্লামের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রুসেডার। অলিভার টুইষ্ট অনেকবার লণ্ডনের পথে নিরাশ্রয়ভাবে বিচরণ করেছে, অনেক ডেভিড কপারফিল্ড কাজের কবলে শৈশব বিসর্জন দিয়েছে। 'লিট্‌ল্‌ ডরিট'এ আবার 'ডেভিড কপারফিল্‌ডের' মত দেনাদারের পরিবারের দুরবস্থা দেখা যায়। 'ওল্ড কিউরিয়াসিটি শপ'এর কিউলিপ বড় চেনা। 'ব্লিক হাউসে' বড়লোকী খেয়ালের যা পরিচয় পাই, তাও নূতন নয়। 'গ্রেট এক্সপেক্‌টেশনে' দুরাশার মরীচিকায় প্রলুব্ধ দরিদ্র সন্তানের ট্রাজেডির অনেক তুলনা ছড়ানো পাই। তবু ডিকেন্স ডিকেন্সই। অমন করে কেউ তাদের দেখেনি, অমন ভালবাসা তারা কোথাও পায়নি। হাসি ও কান্নার মাণিকগাঁথা ডিকেন্সের রচনা। বড় ভাল লাগে। চেষ্টারটনের ভাষায় বলি: "The whole of Dickens' genius is consisted of in taking hints and turning them into human beings."

হিউ ওয়ালপোল 'Mr. Huffam" নামে ডিকেন্সের উপর একটি চমৎকার গল্প লিখেছেন। সেই গল্পটি পড়া প্রকৃত ডিকেন্সকে জানা। ডিকেন্সের বর্ণনা দিয়েছেন—ডিকেন্স যেন আধুনিক লণ্ডনে বড়দিনে একটি অভিজাত পরিবারে অতিথি হয়েছেন। এই পরিবারের তুষারকাঠিন্য ও হৃদয়বিহীন উৎসব কি করে বড়দিনের প্রাণস্পর্শী

উৎসবে পরিণত হ'ল অতিথির উপস্থিতিতে, সেই কাহিনী গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয়। দাড়িমুখে, সেকেলে পোষাকপরা, তামাটে-সুকঠিন মুখভাব, দোহারা সুদৃঢ় শরীর—সারা দেহে উদ্যম ও উৎসাহের বিদ্যুৎ খেলছে। মুখ থেকে হাসি ও করুণা চারপাশে ঝরছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রিয় লেখক, ইংরাজি বড়দিনের স্যান্টাক্লস্ চার্লস্ ডিকেন্স।

বহুদিন আগে লেখা গল্পটি। তখনই ডিকেন্স তাঁব দেশে সেকেলে হয়ে গেছেন। লোকে তাঁর নাম শুনলেও বই পড়ে না। গল্পে ছদ্মবেশী ডিকেন্সকে বলা হচ্ছে: "Poor old Dickens! Hunter is going to rewrite one or two of Dickens' books." হিউ ওয়ালপোল নিজের দেশকে বিদ্রূপ কবেছেন, ডিকেন্সকে দেখেও তারা চিনতে পারেনি।

তা'হলে, ডিকেন্সেব দেশে যদি তাবা ডিকেন্সের বই ধৈর্য ধরে না পড়ে, তা'হলে আমরাই বা পডব কেন?

শেষবার শুনলাম অশরীরী ডিকেন্স বলছেন: "তারা না পডলেও কি তুমিও পড়বে না? তুমি না অনেক বই পড়! বিদেশী, বিদেশকে চিনতে চাও কি নয়া কিতাব প'ড়ে, নানাবিধ ইজমেব প্রাচীর ভেদ ক'রে? ইংলণ্ডের আত্মাকে যদি চিনতে চাও, তাহ'লে আমার কাছে আশ্রয় নাও। আমার মধ্য দিয়ে বিগত যুগের ইংলণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে। তুমি ভুলে যাবে, নিঃসন্দেহে ভুলে যাবে, সাম্রাজ্যলোভী ইংলণ্ডের যে মূর্তি তুমি দেখেছ, সে মূর্তির পেছনেও হয়তো আর একটি অস্তিত্ব আছে। তাকে তুমি কি দেবে? আর কি ঘৃণা করে দূরে সরে থাকতে পারবে?"

নিশ্চিত উত্তর এতক্ষণে দেই: না। ইংলণ্ড যদি ডিকেন্স হয়, সেই ইংলণ্ডকে আমি ভালবাসি।

চার্লস ল্যাম্বের জীবনের একটি দিক

ইংরাজি সাহিত্যের যে কোন আলোচনা-গ্রন্থ খুলুন, যে কোন কবিতা বা গদ্যসংগ্রহ পাঠ করুন, একটি নাম সর্বদা পাবেন—সেটি হচ্ছে চার্লস ল্যাম্ব। কবি হিসাবে যতটা না তাঁর প্রসিদ্ধি ততটা প্রসিদ্ধি 'Essays of Elia'র স্রষ্টিকর্তা হিসাবে। ইংরাজি সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ল্যাম্ব, অন্ততঃ প্রাবন্ধিক জগতে যুগান্তর এনেছিলেন সরস, অন্তরঙ্গ প্রবন্ধের প্রাচুর্য দিয়ে। তবে, তিনি ছিলেন কবি, প্রসিদ্ধ কবি কোল্‌রিজের সহপাঠী। ল্যাম্বের কবিতার মধ্যে যে কয়টি কবিতা বিভিন্ন কাব্য-সংগ্রহে স্থান লাভ করেছে, সেগুলির মাধুর্য যে কোন পাঠককে মুগ্ধ করবে নিঃসন্দেহে।

আচ্ছা, আর একটি নাম, যা সাহিত্য-রসিকেরা কখনও ল্যাম্বের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন, সে নামটি আপনারা শুনেছেন কি? কোন সাহিত্যগ্রন্থে, কোন বিশিষ্ট নাম-তালিকায় সেই নারীর নামের উল্লেখমাত্র নেই। কারণ, তিনি ছিলেন সাধারণ, অতি সাধারণ। জন্মলগ্নে কোন অসামান্যতা তাঁকে চিহ্নিত করেনি, মৃত্যুর পারে অমরত্বের মহিমার তিনি অধিকারী হননি। কিন্তু একমুহূর্তে তিনি অমরত্ব লাভ করতে পারতেন একটি অসামান্য প্রতিভার প্রতিফলিত দীপ্তিতে। সেই নারীর নাম ল্যাম্বের সঙ্গে গাঁথা হয়ে থাকত—রসিকজনের কদাচিৎ অনুকম্পাযুক্ত স্মরণে নয়,—শ্রদ্ধার ভিত্তিতে, চিরস্থায়িত্বের গাঁথুনীতে, যদি তিনি ল্যাম্বের প্রেম গ্রহণ করে তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতেন। নির্বোধের অবিমৃষ্যকারিতায় যে নারী

অমরত্বের অধিকারকে অজ্ঞানতার ভুলে 'ক্ষ্যাপার পরশ পাথরের' মত দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, সেই নির্বোধ নারী হচ্চেন, অ্যানী সিম্‌ন্‌স্।

কবির মানসী প্রিয়া ছিলেন অ্যানী। সর্বাপেক্ষা প্রচলিত কবিতা, 'The old Familiar Faces'-এ আমরা পাই কবি-মানসীর উল্লেখ :—

"I loved a love once fairest among women ;
Closed are her doors on me I must not see her—
All, all are gone, the old familiar faces."

কাব্যাংশটি পড়ে এ তথ্য বোধগম্য হয় যে ল্যাম্ব একদা কাউকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর প্রেমাস্পদা ছিলেন রূপসী। প্রণয় বিয়োগান্ত হয়েছিল। প্রেমিকা কবিকে চান না, তাই কবি দূরে দূরে থাকবেন স্থির করেছিলেন, যদিও হৃদয় তাঁর চাইত প্রেমিকার সন্দর্শন।

ল্যাম্বের জীবন সম্পর্কে শাদা কয়েকটি সংবাদ আমরা জানি। তিনি চিরকুমার ছিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী মেরী সাময়িকভাবে পাগল হয়ে যেতেন। ল্যাম্বের বংশে উন্মাদরোগের একটা ধারা ছিল। ল্যাম্ব নিজেও কিছুদিন উন্মাদাগারে ছিলেন ; কিন্তু সুখের বিষয় পরে কোনদিন তাঁর এই রোগটি দেখা দেয়নি, যদিও তাঁর জীবনের ট্রাজেডি রোগটিকে উপলক্ষ করেই ঘটেছিল। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে ল্যাম্বের জীবনে দায়িত্ব ও দুঃখ দেখা দেয় মেরির সাময়িক উন্মাদনায়। হঠাৎ একদিন মেরী ডিনারের পূর্বে খাবার টেবিল থেকে একখানা ছোরা নিয়ে নিজের মাতাকে সাময়িক উন্মাদনায় হত্যা করে ফেলেন, পিসী ও পিতাকে মারাত্মক আঘাত করেন। ফলে মেরীকে বাতুলাশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়। ল্যাম্ব প্রতিজ্ঞা করলেন সমগ্র

জীবন তিনি ভগ্নীর কল্যাণে উৎসর্গ করবেন। বাতুলাশ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্র মেরীকে তিনি নিজের কাছে আনলেন। তারপরে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর রক্ষনাবেক্ষণের ভার চার্লস্ ল্যাম্ব গ্রহণ করে স্বেচ্ছায় বিবাহিত জীবন, সন্তান, গৃহের আরাম বিসর্জন দেন। ল্যাম্ব আজও তাঁর ত্যাগের মহিমায় বিখ্যাত।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ল্যাম্বের বিষয় এইটুকুই জানেন। কিন্তু ল্যাম্বের জীবনে একমাত্র ট্র্যাজেডি কেবল এটা নয়। বোনের জন্যই যে শুধু তিনি বিবাহ করেননি, তা-ও নয়। নির্মম বিধাতার সৃষ্টিতে হৃদয় দিলেই অন্য হৃদয় পাওয়া যায় এমন কোন ব্যবস্থা নেই। সুতবাং, কবি ল্যাম্ব, সাহিত্যিক ল্যাম্বের হৃদয় যেদিকে প্রধাবিত হয়েছিল, সেদিক থেকে কোন প্রতিদান আসেনি। এ তথ্য ল্যাম্বের জীবনীকার অ্যায়াঙ্গারের পুস্তক খুলে পাঠ করবার প্রয়োজন হ'বে না, ল্যাম্বের একাধিক রচনাব মধ্যে পাওয়া যাবে। ল্যাম্বের রচনা ছিল তাঁর জীবনের আলেখ্য। বন্ধু কোল্‌রিজকে লেখা পত্রাবলী তাঁর জীবন-দর্শন।

'The old Familiar Faces'-এ ল্যাম্ব-মানসীর বিশেষ উল্লেখ পাই আগেই বলেছি। কবির অধিকাংশ কবিতা করুণ। গদ্য রচনায় প্রচুর হাস্যরস থাকলেও সে হাসির অন্তরালে অশ্রুবিন্দু টলমল করছে। জীবনের ব্যথা ল্যাম্ব বহির্জগতে কতটা গোপন করে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন, জানি না, তাঁর কাব্য কিন্তু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। 'হেষ্টারের' কবি ল্যাম্ব শিশুর মৃত্যু দেখতেন, দেখতেন স্বীয় জীবন-খাতার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত। এ অশ্রু-উৎসের জন্ম কোথায়? নিঃসঙ্গ জীবনের ত্যাগমাহাত্ম্যে, না ব্যর্থ প্রেমের দুঃখ-বিলাসে? সমস্ত উত্তর লেখা আছে 'Essays of Elia'-এর 'Dream Children' অর্থাৎ 'স্বপ্নশিশু' প্রবন্ধটিতে।

ল্যাম্ব কল্পনা করছেন তিনি সন্ধ্যাবেলা আগুনের পাশে বসে তাঁর ছেলে জন্ ও মেয়ে অ্যালিসকে নিজের শৈশব ও যৌবনকালের কাহিনী গল্প করে বলছেন। এই সূত্রে Anneকে অ্যালিস্ ছদ্মনাম দিয়ে তিনি প্রেয়সীর বর্ণনা দিচ্ছেন। কন্যা অ্যালিস্ ও পুত্র জন্‌কে তাদের বিগতা মাতা অ্যালিসের বিষয়ে ল্যাম্ব বলছেন :—

'Then I told how for seven long years in hope sometimes, sometimes in despair, yet persisting ever I courted the fair Alice W—n" অর্থাৎ অ্যানী সিমন্‌স্। তারপর "I explained to them what coyness and difficulty and denial meant in maidens"—"আমি তাদের গল্প করে বললাম কেমন করে সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর ধরে, কখনো আশায়, কখনো নিরাশায়, কিন্তু সর্বদা উদ্যোগী হয়ে আমি সুন্দরী অ্যালিস্‌কে প্রণয়নিবেদন করে চলেছিলাম। আমি তাদের আরও বললাম, তরুণী কুমারীর ক্ষেত্রে সঙ্কোচ, বাধা, প্রত্যাখ্যান কি কঠিন রূপে দেখা দেয়।" অপরকে ল্যাম্ব বলছেন—"এই সময়ে হঠাৎ ছোট অ্যালিসের দিকে চেয়ে দেখলাম প্রথম অ্যালিসের দৃষ্টি তার কন্যার চোখে নূতন করে এমনভাবে ফিরে এসেছে যে আমাকে সন্দেহগ্রস্ত হতে হ'ল, কোনজন প্রকৃতপক্ষে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে, কার এই চিক্কন চুল"—

ল্যাম্ব এখানে আগাগোড়া অ্যানীকে 'অ্যালিস' ডেকে গোপনতা আশ্রয়ের চেষ্টা করলেও মনোভাব গোপন করেন নি। এই একটি মাত্র রচনা পাঠ করলেই ল্যাম্বের ব্যর্থ প্রেমের ইতিহাস জানা যায়। তাঁর হৃদয়ের নিঃসঙ্গতা, আকুলতা কল্পনায় স্বপ্নশিশু নির্মাণ করে বাস্তবে পুতুল খেলায় প্রবৃত্ত হয়েছে। অ্যানীকে তিনি নিজের পাশে আগুনের ধারে কল্পনা করতে সাহসী হননি, কারণ অ্যানী ল্যাম্বের

জীবনে চিরকাল একটি বিয়োগান্ত কাহিনী মাত্র। কিন্তু ল্যাম্ব তাঁকে কখনও বিস্মৃত হননি। প্রৌঢ় বয়সে প্রখ্যাত ইলায়ার সৃষ্টিকর্তা ল্যাম্ব বিজন সন্ধ্যায় যে অনাগত সন্তানের স্বপ্নচিন্তায় বিভোর হয়ে আছেন, তাদের জননীরূপে তিনি কল্পনা করেছেন একমাত্র অ্যানীকেই। অন্য নারীর প্রশ্ন তাঁর কাছে উঠতেই পারে না। ক্ষুধিত হৃদয়ের সব আবেগ, অতৃপ্ত প্রেম পিপাসা নিয়ে বারে বারে তিনি অ্যানীর নয়নতারকা, অ্যানীর উজ্জ্বল কেশপাশের কথা চিন্তা করে তৃপ্ত হয়েছেন। সাত বৎসর ধরে তিনি অ্যানী সিমনসের মন পাবার চেষ্টা করেছিলেন। নিরাশা তাঁকে বিরত করেনি। অ্যানীর হৃদয়হীনতাও ল্যাম্বকে ভুলিয়ে দিতে পারেনি তাঁর একনিষ্ঠ, অসীম প্রেম। সে প্রেম গোপনে ছিল কবির অন্তরের অন্তস্তলে। বঞ্চিত জীবনে হয়তো কখনও সে প্রেম সুখচিন্তা এনেছে, ভুলিয়ে দিয়েছে নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতা। তাই 'Dream Children' লেখা সম্ভব হয়েছিল।

অ্যানী কে? ল্যাম্ব তাঁকে ভালবেসেছিলেন, এই অ্যানীর সর্বাপেক্ষা বড় পরিচয়। আর জানবার প্রয়োজন আছে কি? তিনি ল্যাম্বের সমসাময়িক একটি তরুণী। সাধারণ ঘরের। সাত বৎসর তিনি ল্যাম্বকে অনিশ্চিতের মধ্যে রেখে কষ্ট দিয়েছিলেন। অবশেষে একজন সুদব্যবসায়ী পোদ্দারকে তিনি বিবাহ করেন, বিশ্ববিখ্যাত চার্লস ল্যাম্বকে প্রত্যাখ্যান করে। অ্যানীর স্বামীকে ল্যাম্ব 'Dream Children'-এ 'Bartaum' বলে উল্লেখ করেছেন। স্বপ্নকল্পনার মধ্যে হঠাৎ বাস্তবের মূর্তি ল্যাম্বের তন্ময়তায় আঘাত করল। কবি ল্যাম্ব প্রবন্ধকার ল্যাম্ব সজাগ হলেন। তাঁর বিরাট হৃদয় মথিত করে আর্ত হাহাকার উঠল, স্বপ্ন শিশুরা বলছে :

"We are not of Alice nor of thee....We are nothing ;

less than nothing, and dreams". তাঁর শিশুরা স্বপ্নশিশু। কিন্তু আরও করুণ, আরও হৃদয়স্পর্শী বেদনা ল্যাম্বের :

'The Children of Alice call Bartaum their father."

হায়, অ্যালিসের তো সন্তান আছে, কিন্তু তিনি তাদের পিতা নন ! তাদের জনক অন্য পুরুষ।

ল্যাম্বের ব্যর্থ প্রেমেব সকরুণ ইতিহাস এই একটি ছত্রে যেমন পরিস্ফুট হয়েছে, মনে হয় সহস্রখণ্ড জীবনকাহিনী লিখেও তেমন ফোটানো যেত না। অ্যানী সিমনস নির্বোধ নারী, তিনি হৃদয়হীনা ; কিন্তু তাঁকে উপলক্ষ করে যে সব রস সৃষ্টি হয়েছে সেজন্য তিনি ধন্যবাদ পেতে পারেন।

অ্যানীর জীবনে স্মরণীয় ঘটনা ল্যাম্বের ভালবাসা। যে প্রেমিককে তিনি গ্রহণ করেননি, ভাগ্যের পরিহাসে সেই অগ্রাহ্য ব্যক্তির জন্যই আজ আমরা অ্যানী সিমনসের নাম জানি। যে পুরুষকে অপ্রয়োজনীয় বোধে গর্বিতা রূপসী সাংসারিক সুবিধায় লক্ষ্য রেখে ত্যাগ করেছিলেন, সেই অপদার্থ পুরুষের অবাঞ্ছিত প্রেমই আজ অ্যানী সিমনসের ন্যায় সাধারণ নারীকে স্মরণীয় করে তুলেছে।

তবু একটা কথা মনে হয়। চিরকাল কবির মানসী নীরব থাকেন উত্তর-পুরুষের কাছে, কবিই হ'ন মুখর। ফ্যানী ব্রন, অ্যানী সিমনস, এঁরাই নীরব। কবি মুখর। হৃদয়হীনতার অপবাদে লাঞ্ছিতা এইসব নারী। কিন্তু যদি তাঁরা কথা বলতেন ! যদি ফ্যানী ব্রন, অ্যানী সিমনস প্রভৃতি কবিতা লিখতেন, তা'হলে এই সকল বহুখ্যাত প্রেম-আখ্যানে নূতন আলোকপাত হ'ত নিঃসন্দেহে।

আরাবেলা হাণ্ট ও উইলিয়াম কনগ্রীভ

ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারীতে চিত্রকর নেলার প্রসিদ্ধ নাট্যকার কনগ্রীভের একখানি ছবি অঙ্কন করে দিয়েছিলেন। সেই চিত্রখানি অনুধাবন করা মাত্র আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র ইংরাজি সভ্যতার চাবিকাঠির সন্ধান পাই। আর পাই সেই বিশিষ্ট সভ্যতার প্রতীক, ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যনায়ক উইলিয়াম কনগ্রীভের চরিত্র-পরিচয়।

আমাদের দেশে সামুদ্রিক গণনার প্রথা আছে। ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য করে দেখে তাঁর স্বকীয়তার সন্ধান অনেক সময় আমরা ভারতীয়েরা খুঁজে পাই। পোষাক-পরিচ্ছদ মনোনয়নও জানায় পরিচ্ছদধারীর মানসিক প্রবণতা।

সত্যই কনগ্রীভের প্রতিকৃতি অনেক বিষয় জানিয়ে দেয়। লাল ভেলভেটের কোটে সৌখিন বোতাম, গলায় হাল্কা রেশমের উড়ুনি, কুঞ্চিত পরচুল—লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় কনগ্রীভ একজন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত সৌখীন ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের উচ্চস্তরে তিনি বিচরণ করতেন, অর্থের স্বাচ্ছন্দ্য ছিল তাঁর, ছিল রুচি ও সখের সমন্বয়। বাস্তবিক যে উনচল্লিশ জন প্রতিভাশালী স্বনামধন্য ব্যক্তি একত্রিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 'কিট্-ক্যাট্' (Kit-Kat) ক্লাবের সৃজন করেন, উইলিয়াম কনগ্রীভ ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। সুতরাং, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'রেষ্টোরেশন' যুগের সভ্যতা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেছিলেন এই প্রসিদ্ধ মিলনান্ত-নাট্যরচয়িতা কবি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট কৌতূহল থাকলেও দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্ত আমবা রেষ্টোবেশন কমেডির সঙ্গে বিশেষ পরিচিত নই। উইলিয়াম কন্‌গ্রীভেব উজ্জ্বল নাটকগুলি তাই আজ পর্যন্ত পুস্তকাগারে অনাদৃত, ধুলিমলিন আলমাবীতেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। ক্বচিৎ কোন সাহিত্যছাত্র তাদেব সন্ধান নেয়।

কিন্তু রসে, প্রতিভায়, পরিহাসে সমুজ্জ্বল যাঁব নাটক, যাঁকে সমালোচকেবা অকুণ্ঠচিত্তে রেষ্টোবেশন যুগেব শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলে অভিহিত কবেছেন, বহু তারকায় উজ্জ্বল অষ্টাদশ শতাব্দীব সাহিত্য-গগনে যিনি স্বকীয় দীপ্তিতে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক, তাঁব কথা ভাল করে জানতে কি ইচ্ছা হয় না? ইচ্ছা কি হয় না জানতে, কে এই প্রতিভার প্রেবণাব উৎস, 'কবির অন্তরে কবি' কে?

ইতিহাস বলে কনগ্রীভ অকৃতদাব ছিলেন। সে কথা সত্য। আজন্ম বান্ধবী প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী অ্যানী ব্রেস্‌গার্ডলেব সঙ্গে একদা কনগ্রীভের গোপন বিবাহেব যে গুজব উঠেছিল তা মিথ্যা। চিরকুমার, দাম্পত্যপ্রেমবর্জিত জীবন কি তাহ'লে বসশূন্য হযে গিযেছিল? অত বসের প্রস্রবণ তাহ'লে রচনায় আসে কোথা থেকে? আবাব কনগ্রীভের প্রতিকৃতি তাঁর চবিত্রেব নিগূঢ় দিকেব নির্দেশ জানায়। প্রশান্ত মুখচ্ছবি, ভাবময় চক্ষু, কবিসুলভ স্ফুবিত অধরোষ্ঠ—কমনীয় লাবণ্য। এমন যে ব্যক্তি, অবশ্যই তাঁর মনে প্রেম ছিল, যদিও পরিণয়ের বন্ধনে সে প্রেম ধরা দেয়নি।

কনগ্রীভের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি আলোচনা কবে আমরা পাই, কবির জীবনে বিভিন্ন নারীর উদয়। সেই-যুগপ্রচলিত লঘু প্রথায় কনগ্রীভ বহু উল্লেখযোগ্যা নারীর সঙ্গে প্রেমচর্চা করেছিলেন। বান্ধবীও ছিলেন তাঁর অনেক। যাঁবা কবির জীবনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে 'নাট্যমঞ্চের ডায়না' মিসেস ব্রেসগার্ডেল,

মার্লবরোর ডাচেস হেনরিয়েটা, লেখিকা মিসেস ট্রটার অন্যতমা। আর—সকলকে আচ্ছন্ন করে আর একটি নাম অসংখ্য মহিলাবৃন্দের মধ্য থেকে দীপ্ত হয়ে ওঠে—আরাবেলা হাণ্ট।

আরাবেলা হাণ্টকে চিনবার পূর্বে কনগ্রীভকে চেনা প্রয়োজন। চেনা প্রয়োজন অষ্টাদশ শতাব্দীতে দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্য গ্রহণের পরের প্রতিক্রিয়াশীল ইংলণ্ডকে।

১৬৭০ খৃঃ বারসে নগরে কনগ্রীভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ মর্যাদা ও আভিজাত্যে প্রাচীন ছিল। তিনি নামী স্কুল-কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ লেখক সুইফ্‌টের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। আজীবন উভয়ের এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। সুইফ্‌ট তাঁর প্রিয়া 'ষ্টেলাকে' যে সব পত্র লেখেন, তার মধ্যে ক্রমাগত কনগ্রীভের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

কনগ্রীভ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিকতা কনগ্রীভের মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছিল সংস্কৃতি ও প্রতিভার সমন্বয়ে। তাঁকে বেষ্টন করে সহজেই একটি প্রতিভাশালী রচয়িতা ও সম্ভ্রান্ত অভিজাতবংশীয়ের ভিড় গড়ে ওঠে। ষ্টীল, পোপ, ডেনিস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকেরা সর্বদা কনগ্রীভের বাড়ী আসা-যাওয়া করতেন। সে সময়ের স্বনামধন্যা মহিলা, একাধারে কবি ও নাট্যকার মিসেস ট্রটার কনগ্রীভের বিয়োগান্ত নাটিকা 'The Mourning Bride' দেখে ও পাঠ করে মোহিত হয়ে কনগ্রীভের বন্ধুত্ব প্রার্থনা করেন। স্বয়ং ভলটেয়ার কনগ্রীভের দেখা পাবার জন্য তাঁর গৃহে যেতেন এবং তাঁর লিখিত 'Letters Concerning the English Nation' বইতে কনগ্রীভের বিষয়ে লিখেছিলেন—"Mr. Congreve has raised the glory of Comedy to a greater height than any English writer before or since his

time.” ডাচেস হেনরিয়েটা ছিলেন কনগ্রীভের অনুরক্তা শিষ্যা। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কনগ্রীভ হেনরিয়েটার সঙ্গে ‘বাথ’ শহরে বিচরণ করে বেড়াতেন। ১৭২৮ খৃঃ কনগ্রীভ বাথ থেকে ফেরার পথে গাড়ীর দুর্ঘটনায় আহত হ’ন। কিছুদিন থেকেই স্বাস্থ্য তাঁর খারাপ যাচ্ছিল। এই আঘাত তাঁকে শয্যাশায়ী করে। ধীরে ধীরে তিনি ক্ষয় প্রাপ্ত হ’তে লাগলেন। অবশেষে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ৫৯ বৎসর বয়সে অমর নাট্যকার কনগ্রীভের জীবনান্ত ঘটে।

নাটক লিখতে আরম্ভ করার পরেই কনগ্রীভ নাট্যকার ড্রাইডেনের সংস্পর্শে আসেন। যখন কনগ্রীভ কলেজে অধ্যয়ন করতেন, তখন থেকেই তিনি রচনাকার্যে মনোনিবেশ করেন। তাঁর প্রাচীনতম রচনা একখানি উপন্যাস ‘Incognita’। তার পরে প্রথম নাটক ‘The Old Bachelor’। কনগ্রীভ তখন আইনের ছাত্র। কিন্তু, সহসা একটি নাটকই তাঁকে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে অধিরোহণ করাল।

‘The Old Bachelor’ লণ্ডনের নাট্যমঞ্চে অভিনীত হয়। ত্রিংশ বর্ষ বয়স্কা, প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী অ্যানী ব্রেস্‌গার্ডেল নাটকে অবতীর্ণ হন। কনগ্রীভের সঙ্গে জীবনব্যাপী বন্ধুত্বের এই তাঁর সূত্রপাত। এই কঠিনহৃদয়া সাবধানী অভিনেত্রীর জীবনে একটি মাত্র বিচ্যুতির সন্ধান আমরা পাই—সে কনগ্রীভ। তেইশ বৎসর বয়সে ‘The Old Bachelor’-এর রচয়িতা কনগ্রীভ ইংলণ্ডের সর্বপ্রধান নাট্যকার ও কবি নামে স্বীকৃত হ’লেন। আইন অধ্যয়ন ত্যাগ করে কনগ্রীভ লণ্ডনে নাট্যকার-জীবন গ্রহণ করলেন। তারপর একের পর এক লেখকের জীবনে সৌভাগ্য সূচিত হ’তে আরম্ভ হ’ল। কেবল যশ নয়, কেবল বন্ধু নয়, অর্থ ও সামাজিক

সম্মান ভাগ্যলক্ষ্মী অকাতরে কনগ্রীভকে প্রদান করেছিলেন। সরকারী বড় বড় অর্থকরী পদ কনগ্রীভ লাভ করলেন, লণ্ডনের নাট্যমঞ্চের অংশীদার হ'লেন, তাঁর চতুষ্পার্শে লণ্ডনের সৌখিন যুব-সম্প্রদায় মধুচক্র রচনা করে তাঁকে আবেষ্টন করে রইল। প্রেম ও সৌন্দর্য তাঁকে বরণ করে নিল।

উইলিয়াম কনগ্রীভের জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় ১৭০৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৬৯২ সালের নাটক 'The Old Bachelor', ১৬৯৩ সালের নাটক 'The Double Dealer'। কিন্তু শেষোক্ত নাটকখানি অভিজাত সম্প্রদায়ের মনঃপূত হয়নি। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছিল কনগ্রীভের অস্ত্র। তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্তঃসারশূন্য সমাজের স্বরূপ নির্মম হস্তে উন্মোচন করেছিলেন। ফলে, নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'বার পরে সাফল্য লাভ করেনি, তবু, রাজ্ঞী মেরী 'The Double Dealer'-এর দর্শক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। তাই রাজাদেশে নাটকটির পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। কনগ্রীভের পরবর্তী নাটকের নাম 'Love for Love'। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর শেষ নাটক, তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক, 'The Way of the World' লেখা হয়েছিল। একখানি বিয়োগান্ত নাটিকাই মাত্র কনগ্রীভ লিখেছেন—'The Mourning Bride' (১৬৯৭)। এছাড়া কনগ্রীভের লেখা অজস্র কবিতা আছে। রাজ্ঞী মেরীর মৃত্যুর পরে লেখা 'The Mourning Muse of Alenis' কবিতাটি সমধিক প্রসিদ্ধ।

কনগ্রীভের আকৃতি সম্বন্ধে জীবনীকার এডমাণ্ড গসে বলেন যে, কনগ্রীভ সুপুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিও সাক্ষ্য দেয় এ তথ্যের। তাঁর চোখ ছিল গভীর ও সুন্দর দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয় ধারণ করতেন। অতি সুচারুসম্পন্ন বেশভূষা ছিল তাঁর।

নাগরিকসুলভ মার্জিত ব্যবহার ও সরস বাক্যালাপ, সহৃদয় আচরণ ও সহানুভূতি কনগ্রীভকে অতি প্রিয় করেছিল তাঁর বন্ধুবান্ধব, নাগরিক ও অভিজাত সমাজে। নাট্যকার হিসাবে তাঁর খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত তখন। কনগ্রীভের সময় থেকে ইংরাজি নাটক নবজন্ম লাভ করে। পরিহাস ও বিদ্রূপে সমুজ্জ্বল ভাষার মাধ্যমে এক অভিনব সাহিত্য কনগ্রীভ সৃজন করে গেলেন। প্রকৃতপক্ষে, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্য কনগ্রীভের সময় থেকেই আরম্ভ হয়।

এই কনগ্রীভ! দ্বিতীয় জেমসের রাজত্বের কঠোর নীতিবোধ দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বে লোপ হ'ল। ফরাসী দেশের আব্‌হাওয়া দ্বিতীয় চার্লসের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজসভায় চলে এল। কফি-হাউসে অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্যযুবকেরা অভিনেত্রী ও গায়িকাদের নামে কবিতা লিখে সময় কাটাতে লাগলেন।

সেই ইংলণ্ডের গ্লানিকর সহজিয়া প্রেমের আব্‌হাওয়া; যেখানে নীতিবোধ রসাতলে ডুবে যায়, সেখানে রাজপুরুষ স্বয়ং উচ্ছৃঙ্খল; সেই রেষ্টোরেশন যুগে কনগ্রীভের মনে একটি অতুলনীয় প্রেমের কুসুম বিকশিত হয়ে উঠল—আবাবেলা হার্ণ্ট।

মিসেস আরবেলা হার্ণ্ট ছিলেন তাঁর সময়ে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধা গায়িকা। কণ্ঠমাধুর্যে তিনি সর্বসাধারণের মনোহরণ করেছিলেন। তাছাড়া বীণা-যন্ত্রবাদনেও তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। সে যুগে বহু কবিই আরাবেলা হার্ণ্টের উদ্দেশে প্রেমগাথা রচনা করেছিলেন। এই সুন্দরী ছিলেন প্রকৃত মোহিনী। কনগ্রীভ তাঁকে একান্তভাবে ভালবাসেন।

এ কথা সত্য—কনগ্রীভের জীবনে প্রেরণার একমাত্র উৎস মনোহারিণী আরাবেলা ছিলেন না। অ্যানী ব্রেস্‌গার্ডলের জন্য

কনগ্রীভ তাঁর নাটকে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা লিখে অ্যানীকে সমাজে যথেষ্ট প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সর্বপ্রসিদ্ধ নাটক 'The Way of the World'-এ Millament-এর চরিত্র অ্যানীর জন্যই লেখা হয়। সারা জীবন উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তবুও অ্যাষ্টন বলেন যে অ্যানী কনগ্রীভের বন্ধু ছাড়া কিছু নন। মৃত্যুকালে উইলে কনগ্রীভ সমস্ত সম্পত্তি হেনরিয়েটাকে দিয়ে যান, অ্যানী সামান্য টাকা পান। অথচ ডাচেস হেনরিয়েটার আর টাকার প্রয়োজন ছিল না।

শেষ জীবনে ডাচেস অফ মালবরো কনগ্রীভকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন। কিন্তু, কনগ্রীভের জীবনে তখন আরবেলা হার্ণ্ট আর ছিলেন না। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে আরাবেলা মারা যান। ইতিহাস ও চরিতকার নির্বাক থাকলেও আমরা লক্ষ্য করি ওই সময় থেকে কনগ্রীভের স্বাস্থ্যের দারুণ অবনতি ঘটে। অমিতাচারের ফলে কনগ্রীভের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তিনি স্থূলকায় ছিলেন। বাতব্যাধি তাঁকে আক্রমণ করল, তাঁর দৃষ্টিশক্তি খারাপ হ'তে আরম্ভ করল ; এবং ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি নাট্যজগৎ ও রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরবিদায় নেন। কেউ কেউ বলেন যে শেষ নাটকখানির অসাফল্যই হয়তো এই বিদায়ের কারণ। কিন্তু আরাবেলার মৃত্যুর বৎসরে এতগুলি দুর্ঘটনার একত্র সমাবেশ দেখে নিরপেক্ষ সমালোচকেরও সন্দেহ হয় যে, হৃদয়ঘটিত কারণেরও প্রাবল্য ঘটেছিল।

যে কনগ্রীভকে এতক্ষণ ধরে দেখে এলাম, যাঁর জীবনে নানা বিচিত্র সুরের ঐক্যতান শোনা গেল, তাঁর পরিহাসপ্রবণ লেখনী প্রেমের সম্মোহন শক্তি লাভ ক'রে অন্য রূপ ধরেছিল। আরাবেলা সত্যই প্রেরণা দিয়ে কনগ্রীভকে নবজন্ম দিয়েছিলেন। কনগ্রীভ তাঁর

'Maid's Last Prayer'এ অষ্টাদশ শতাব্দীর গ্যালাণ্টসুলভ হাল্কা সিনিকের ঢংএ গেয়েছিলেন:

—"You think she is false.

I'am sure she is kind,

I'll take her body,

You her mind.

Who has the better bargain?" ইত্যাদি। সেই একই কবি আরাবেলাকে উদ্দেশ করে যে অনবদ্য প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ শোনাচ্ছি। সহস্র ছত্র লিখে যা বোঝানো যায়না, কনগ্রীভের কাব্য পাঠমাত্রে তা বোধগম্য হ'বে। ('The Ode on Mrs. Arabella Hunt Singing')

স্তব্ধ হোক সব কিছু, গতি হোক নির্বাপিত
অশান্ত চিন্তার দ্বন্দ্ব সুষুপ্তিতে উপনীত।
নিশ্বাস মৃদুল বয়,
সেও যেন মৃত্যুময়;
আর তুমি ধীরে চল, হে দুরন্ত, উন্মাদ হৃদয়!
হে আমার দুরন্ত হৃদয়, আব গতি নয়।
ধমনী নিশ্চল হও,—শোনিতের মত্ত ধারা,
জীবনের উৎস, সেও থেমে যাক, যাক তারা।
অতলান্ত মরণেতে ডুবে যাই, ডুবে যাই—
তার কণ্ঠ, তারি কণ্ঠ সারা সত্তা দিয়ে চাই;
তার গান কানে নিয়ে আমি যেন মৃত্যু পাই।

রেষ্টোরেশন কমেডির অশ্লীলতা-মেষা ধারালো ছুরীর ধারে এমন সুকোমল পুষ্পশোভা! বিস্মিত হ'তে হয়, কনগ্রীভের বিচিত্র বহুধা জীবনে এক গীতিময়ী এত গভীর রেখা এঁকে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কনগ্রীভ আরাবেলার জীবনকালে তাঁকে অশান্ত আবেগে ভালবেসেছিলেন। বিক্ষিপ্ত কুমারহৃদয়ের সমস্ত আবেগ একটি কেন্দ্রেই সেদিন সংযত হয়েছিল। সারা পৃথিবীকে কনগ্রীভ ভুলে গিয়েছিলেন একটি নারীর জন্য। অন্যান্য প্রেমতারকা তাঁর গগনে সূর্যোদয়ের মত আরাবেলার উদয়ে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। লঘু সিনিকের তীক্ষ্ণ অসি সহসা কুসুমায়ুধে পরিণত হ'ল বিদগ্ধ কনগ্রীভের হাতে। আরাবেলাকে লেখা কনগ্রীভের প্রেমপত্র তাঁর উন্মাদনার সাক্ষ্য দেয়। তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপের কশাঘাতে সমসাময়িক সমাজকে বিক্ষত করতে ভুলে গেলেন, নাটকের পরিবর্তে লিখলেন তিনি গীতি-কবিতা আরাবেলার গুণকীর্তন করে। রচনাকারের প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর রচনা। সুন্দরী আরাবেলা যে নাট্যকার কনগ্রীভকে কতখানি প্রেরণা দিয়েছিলেন, আমরা তা সম্যক বুঝতে পারি কবি কনগ্রীভের কাব্যপাঠে।

জানি না যদি আরাবেলা হার্ণ্ট ১৭০৫ সালের পরে বেঁচে থাকতেন তাহ'লে কনগ্রীভের জীবন কি রূপ নিত। কিন্তু মৃত্যু অকস্মাৎ কনগ্রীভের প্রেয়সীকে হরণ করে নিল। কালের খাতায় তিনি হৃদয়হীনা বা লঘুচিত্তার রূপে ধরা পড়বার অবকাশ পেলেন না। সঙ্গীতময়ীর সমস্ত গান নির্বাক হয়ে গেল মরণের পাষাণ-সমাধির নীচে।

কনগ্রীভের রচনা, আরাবেলার মৃত্যু-উচ্ছ্বাস কবিতাটি পাঠ করে আমরা শেষ করব। 'কবির অন্তরে কবি' মোহিনী আরাবেলার উদ্দেশে প্রেমিক কনগ্রীভ লিখে গেছেন :—

"Were there on earth another voice like thine,
Another hand so blessed with skill divine,
The late afflicted world some hopes might have,
And harmony retrieve you from the grave."

হায়, পৃথিবীতে যদি তোমার মত কণ্ঠ আর একটি থাকত, যদি

তোমার মত নিপুণ করাঙ্গুলি পাওয়া যেত। তাহ'লে, তোমার শোকে মুহ্যমান ধরণী কোন আলোর সন্ধান পেত। কারণ, তোমার মত কোন সঙ্গীতই তোমাকে সমাধি থেকে ফিরিয়ে আনতে পারত।

কালের নির্মম হাত অনেক শোভনতা মুছে নিয়েছে, মুছে গিয়েছে অমর নাট্যকার উইলিয়ম কনগ্রীভকে, মুছে নিয়েছে অনির্বচণীয়া আরাবেলা হাণ্টকে, কিন্তু তবু কালের শাসন অতিক্রম করে আমাদের কাছে ইতিহাস পাঠিয়ে দিল তাদের প্রেম।

গ্যেটে

মনীষা ও মনীষী কথা দুইটির অর্থ নানাভাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। কারণ, মনীষী মনীষা-সম্পন্ন হ'লেই মনীষী হ'ন সত্য, কিন্তু বহু সময়ে সেই মনীষা আদ্যোপান্ত ধী হয়নি। অনুপ্রেরণার মূল কেবল মস্তিষ্ক নয়, অনেক বস্তুই। মনীষীর মনীষা বহুক্ষেত্রে বাইরের প্রেরণায় উৎকর্ষ লাভ করে। শিল্পীর প্রেরণাদাত্রী দেবী বা মিউস্‌কে (Muse) মানবীরূপে দেখতেও আমরা অভ্যস্ত। মানবীর সপ্রেম দৃষ্টিক্ষরণে মনীষীর হৃদয়ে প্রেরণা এসেছে। মনীষা সেখানে মানসীরূপে অবতীর্ণা। মনীষা সেখানে প্রেমরূপে উৎসারিত। এমনি দেখা যায় গ্যেটের জীবনে।

য়োয়ান উল্‌ফ্‌গ্যাংগ্‌ গ্যেটে (Johann Wolfgang Goethe) জার্মাণীর ফ্রাঙ্ক্‌ফোর্ট-অন্‌-দি-মেন্‌ (Frankfort-on-the-Main) শহরে ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্য, নাটক, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চস্তরের মনীষী গ্যেটে ছিলেন।

বাল্যজীবনে গ্যেটের প্রভাব পরে তাঁর হাস্যমুখী, স্নেহময়ী মাতার। মাতার সাহচর্যে বালক গ্যেটে জীবনের প্রথম চেতনার উন্মেষ লাভ করেন। মা ভালবেসে ছেলেকে নানা দেশের গল্প বলে যেতেন। মাতার কাছ থেকেই গ্যেটে গল্পবলার শিল্প শিক্ষা করেন, এবং আনন্দ নির্বিচারে গ্রহণ করতে শেখেন। গ্যেটের পিতা ছিলেন কিন্তু গুরু-গম্ভীর পণ্ডিত মানুষ। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা অবশ্য সন্তানের চরিত্রেও সংক্রামিত হয়েছে। মাতার আনন্দপ্রিয়তার সঙ্গে পিতার কঠোরতা সন্তানের চরিত্রে একত্রিত হয়েছিল বলেই গ্যেটে বহুবার সম্পূর্ণ

অধঃপতন থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন পরবর্তী জীবনে।

গ্যেটে সম্পন্ন গৃহের সন্তান। সারাজীবন তিনি সুখলালিত। অন্যান্য সাহিত্যিকের মত অভাব তাঁকে কখনই গ্রাস করেনি। ১৭৬৫ সালে তিনি প্রথম আইন অধ্যয়ন আরম্ভ করলেন। এই তিনটি বৎসর পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের খ্যাতি দ্বারা চিহ্নিত হ'লেও অমিত ব্যয়, উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহাব দ্বারা বিক্ষিপ্ত। অধ্যয়নের সময় লঘু আনন্দে তিনি সর্বদা নিমজ্জমান থাকতেন বলে শোনা যায়। ফরাসী নাট্যকারদের নাটক রঙ্গালয়ে ক্রমাগত দেখে দেখে তিনি যে একটি প্রভাব বহন করে এনেছিলেন, তাব ফলে তিনি হু'খানি কমেডি লিখে বাড়ী ফিবলেন। পড়া শেষ হ'ল না, কারণ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়েছিল। ক্রুদ্ধ পিতার সান্ত্বনা হ'ল সেই নাটক হু'খানি।

লেপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়েব (Leipzig) দিনে গ্যেটের জীবনে একটি চির নূতন অথচ পুরাতন সুর বেজে উঠল। কৈশোবেব অন্তে জীবনের যৌবন-দেউলে প্রেমের পদক্ষেপে তরুণ গ্যেটের মন নূতন ভাবগ্রহণে তৎপব হ'ল। কিন্তু হায়, কবির জীবনে আমরা কোন প্রেমেই স্থায়িত্ব দেখি না। একেব পর এক তারা এসেছিল। তাদের প্রত্যেকেই গ্যেটেকে কিছু দিয়ে গেছে। সেই অধ্যায়ে গ্যেটের সাহিত্য রচনায় আমরা এই সব লঘু প্রেমের ছায়া দেখে থাকি। তারা হয়তো নীতিবাগীশের দৃষ্টিতে অবান্তর আপদ, কিন্তু শিল্পীজীবনে তারা অনুপ্রেরণার সাক্ষর।

লেপজিগের পবে গ্যেটে ষ্ট্রাসবুর্গএ (Strasburg) দুই বছর অধ্যয়ন করেন। এখন তিনি প্রাচীন জার্মাণ মহাকাব্যগুলি ও সেক্সপীয়রের রচনায় অনুরাগী হলেন। ফলে, গ্যেটেকে 'ঝড়তুফান' (storm and stress) আন্দোলনের নেতা রূপে দেখি। নবীন জার্মানী তখন

ফরাসী ক্লাসিক-প্রভাবমুক্ত সাহিত্যের জন্ম চাইল। ঝড়তুফানে প্রাচীন বন্ধন, সংস্কার উড়িয়ে দিয়ে বাস্তব এবং স্বাভাবিকের মিলনে এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা জার্মানীর শোণিতের প্রতিক্রিয়া-পন্থী গতি আহ্বান করল। তরুণ গ্যেটে এই আন্দোলনের প্রধান হোতা। গ্যেটের মনীষা অনুধাবনের পক্ষে আন্দোলনগুলি স্মরণীয়। গ্যেটে বাহিরের প্রভাবের দ্বারা যথেষ্ঠ অনুপ্রাণিত হতেন। ষ্ট্রাসবুর্গে গ্যেটে শিল্প শিক্ষার সঙ্গে Doctors Juris উপাধি পেলেন। গ্যেটে এই সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করলেন। পরের রচনায় প্রভাব পড়েছে ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যের। যৌবন চাঞ্চল্য ও উদ্দামতা শান্ত সৌন্দর্যস্বপ্নে মগ্ন, দেখা যায়।

গ্যেটের দীর্ঘ (১৭৪৯-১৮৩২) তিরাশী বৎসরের জীবন কর্মময়। তিনি অজস্র রচনায় জার্মান সাহিত্য সমৃদ্ধ করে গেছেন। নাটক, গদ্য রচনা, গীতিকবিতা, কাহিনী, কাব্য, প্রতি ক্ষেত্রেই গ্যেটে অনন্য। রাজনীতি, নাটক-প্রয়োগ ইত্যাদি কাজও রচনার মধ্যে দেখা যেত। ছবি আঁকার দিকে গ্যেটের প্রবণতা ছিল, সঙ্গীতের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বন্ধুভাগ্য ছিল তার অসীম। প্রসিদ্ধ কবি শীলারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব বিখ্যাত।

কিন্তু গ্যেটের জীবন যশ-সম্মান-অর্থ-কর্ম সমৃদ্ধ একখানি পরিপূর্ণ চিত্র হ'লেও মানসিক শান্তি তাঁর প্রায়ই ব্যাহত হ'ত। রোগ, বন্ধু বা স্বজনবিয়োগ, ভাগ্যপরিবর্তন মানুষমাত্রকে সহ্য করতে হয়। গ্যেটের অংশে ভাগ্য অধিকন্তু কিছু দেননি। কিন্তু গ্যেটের মানসিক বিক্ষোভের প্রধান কারণ তাঁর জীবনের অজস্র প্রেম। শিল্পী বা সাহিত্যিকের ভাগ্যে মহিলার প্রীতি প্রায়ই লাভ হয়। কিন্তু গ্যেটের জীবন কবির ভাষায় একটি অবিচ্ছিন্ন প্রেমের মালিকা ছিল।

গ্যেটের প্রেমপাত্রীদের সংখ্যা এতই অধিক যে কোন জীবনীকারই সঠিক তালিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠতমা কে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হ'ননি। প্রকৃত পক্ষে কবি গ্যেটের জীবনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নারীর প্রাধান্য আমরা পাই। তাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগ নেই। অতি বৃদ্ধ বয়সেও গ্যেটে কিশোরীদের প্রেমলাভে সক্ষম হয়েছিলেন। কবির জীবনে এ-ও এক বিশেষত্ব।

গ্যেটের সাহিত্য কর্মের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল এই সব প্রেমিকা নারী। গ্যেটের জীবন-ইতিহাস ও চরিত্র সম্যক অনুধাবন করা যায় তাঁর প্রত্যেকটি রচনাসৃষ্টি থেকে। কবি সেখানে অনাবৃত। প্রথম জীবনে হাল্কা আমোদ, নৈতিক শিথিলতা থেকে কবি উত্তর-কালে অব্যাহতি লাভ করেছিলেন আত্মিক স্বাধীনতা ও নিয়মানুগত্যার মধ্যে। কবির সেই সংগ্রামের সাক্ষ্য তাঁর রচনার প্রতি পৃষ্ঠায় লেখা আছে। কার্লাইল বলেছেন: গ্যেটের রচনায় মানবিক আত্মার বৃহত্তর জগতের মধ্যে মুক্তিপ্রয়াসের সাধনা দেখা যায় সুস্পষ্টভাবে।

অসংখ্য রচনার মধ্যে গ্যেটের একখানি পুস্তকের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত আছি। গ্যেটের শ্রেষ্ঠ-রচনা কাব্য-নাটক 'ফাউষ্ট' (Faust) বিশ্বসাহিত্যে অমর কীর্ত্তির স্বাক্ষর। দুইভাগে লিখিত সুদীর্ঘ এই পুস্তকে কবি জার্মানীর পুরাতন রহস্যময় কাহিনীটি ব্যবহার করেছেন। জার্মাণ পণ্ডিত ফাউষ্ট ক্ষমতার লোভে শয়তানের অনুচর মেফিষ্টিফিলিসের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিলেন। সেই রসাতলগামী মানবের মুক্তির শেষ ইতিহাস গ্যেটের অমর কাহিনী 'ফাউষ্ট'। গ্যেটের নিজের জীবনের অপূর্ব, অকথিত ইতিহাস। গ্যেটে নিজেই জীবনের প্রথম ছাব্বিশ বৎসরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অসংখ্য জীবনীকারও তাঁর

জীবন লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কিন্তু ফাউষ্টের মত জীবনকাহিনী দুর্লভ।

প্রলোভন, পাপ, দুরাশার মোহমণ্ডিত পথে যে কবির নিশঙ্ক পদক্ষেপ, সেই কবি দেবদূতের আশ্রয় ভিক্ষা করেছেন। ফাউষ্টের প্রথম খণ্ড প্রেমের মাদক চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড সংযত দৃঢ়তা। ১৮৩১ সালে দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশিত হয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, গ্যেটের মনীষার অবলম্বন বহু সময়ে ছিল তাঁর প্রেম-জীবন। বিচিত্র, বহুমুখী, অনন্ত প্রেম-জীবন গ্যেটের। এক একটি নারীর গ্যেটের উপর প্রভাব আশ্রয় করে বহু লেখক পুস্তক রচনা করে গেছেন। শারলৎ বুফের (Charlotte Buff) অথবা 'লটে'র (Lotte) কাহিনী জার্মান ঔপন্যাসিক টমাস্‌ম্যানের লেখনীর উপজীব্য হয়েছে। গ্যেটের জীবনে প্রধান প্রেম লটে— প্রেমের অনুপ্রেরণা তাঁকে যশের স্বাদ এনে দিল। এই সময়ের অনুপ্রেরণা সাহিত্যে যে নূতন স্বর এনেছিল, তার মধ্যে প্রধান দুইখানি নাটক 'Cotz' এবং উপন্যাস 'Werther' (১৭৭৩ ও ১৭৭৪)। শেষোক্ত উপন্যাসে শারলতের প্রতি গভীর প্রেমের অভিজ্ঞতা ছত্রে ছত্রে ব্যক্ত আছে। কার্লাইল আবার বলেছেন: জগতের সমগ্র হতাশার স্বর এখানে। বন্ধুর বাগদত্তা লটে ভাবী স্বামী (Kestner) কেসনারের প্রতি কখনও প্রেম হারাননি এবং অবশেষে কেসনারকেই বিবাহ করেন। লটের অনন্যসাধারণ চরিত্র গ্যেটের হতাশা ও গৌরব। কেস্‌নার, গ্যেটে ও লটের আমরণ বন্ধুত্ব আশ্চর্য ও মধুর। তবু গ্যেটের জীবনের বিস্ময়, কোন প্রেমই তাঁকে একনিষ্ঠ করতে পারেনি। একটির কক্ষে আর একটি গ্রহ এসেছে গ্যেটের প্রতিভায় আত্মাহুতি দিতে।

শারলৎ ভন্‌ষ্টীন, লিলি, ফ্রেডেরিকা প্রভৃতি নায়িকা কবির

প্রেমগীতির উৎস। ম্যাক্স্ ব্রেনটানে গ্যেটের বন্ধুর স্ত্রী। গ্যেটে নানা কারণে ম্যাক্সকে দূরে রাখতে বাধ্য হন। এই সময়ে Fritz Jacobi নামে একজন উচ্চ বংশের যুবকের সঙ্গে গ্যেটের গভীর বন্ধুত্ব হয় (১৭৭৪)। জাকবির অনুপ্রেরণা গ্যেটের কাছে অন্য জগতের দ্বার আবার খুলে দিল। এই বৎসরে গ্যেটের অমর রচনা 'ফাউষ্টের' প্রথম সূচনা। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরব্যাপি সময়ে অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রিয়তম সৃষ্টি 'ফাউষ্টের' নায়িকা মার্গারেট এই চরিত্র চিত্রনে মনীষী গ্যেটের মনীষা পূর্ণ বিকশিত হয়। যত নারীকে তিনি ভালবেসে ছিলেন, যত নারীর প্রেম তাঁকে ধন্য করেছিল, তাদের মূর্ত প্রতীক মার্গারেট। মার্গারেট গ্যেটের মানসী।

আলউইন, আঞ্জেলিকা, আনা 'রোমান এলেজির' উৎসাহদাত্রী অনামিকা নারী, সকলেই কবির প্রতিভায় তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিলেন। গ্যেটেকে পেশাদার প্রেমিক মনে করলে ভুল করা হবে। তাঁর প্রতিভার উদ্দীপ্ত শিখা স্বাভাবিক ভাবেই নারীকে পতঙ্গের মত আকর্ষণ করে আনত। তাই বাহাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ গ্যেটেকে পনেরো বছরের মেয়ে উল্‌রিক (Ulrike) পছন্দ করেছিল। নায়িকার মা অন্তরায় না হলে হয়তো বৃদ্ধ গ্যেটের জীবনে আবার বিবাহ-গ্রন্থি রচিত হয়ে যেত। মারিয়ানী (Marianne Von Willemer) সারাজীবন পূর্ণ চন্দ্রের দিনে গ্যেটেকে স্মরণ করে বিহ্বল হতেন। যোয়ানা, পোপেনলাউয়ার ডাচেস্ আমিলিয়া, শিল্পী কারোলিন (Caroline Bardua) ইত্যাদি বান্ধবীর ও ভক্ত শিষ্যার নামে গ্যেটের জীবন কাহিনী এতই আচ্ছন্ন, যে সমস্ত নামের তালিকা প্রণয়ন হয়তো অসাধ্য।

তবে গ্যেটের সহধর্মিনীর অবদান কতটুকু? ক্রিশ্চিয়ানী ভুল্‌পিউস্

(Christiane Vulpius) উচ্চবংশীয় মহাকবি, যশস্বী গ্যেটের সমান পর্যায়ে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি দরিদ্র, নীচবংশীয়া ছিলেন ও পুষ্প উৎপাদন-কেন্দ্রে মজুরী করতেন। কথিত আছে, তিনি কোন পার্কে গ্যেটের কাছে ভ্রাতার জন্য আবেদনপত্র হস্তে দেখা করেন। গ্যেটে পূর্বেই তাঁর মাধুর্য ও সারল্যে মোহিত ছিলেন। এখন সঙ্গিনীরূপে তাঁকে গ্রহণ করলেন ও নিজের প্রাসাদে এনে বসবাস আরম্ভ করলেন। আইনসঙ্গত বিবাহ না হ'লেও গ্যেটের মহিমায় মুগ্ধা ক্রিশ্চিয়ানী গ্যেটের একান্ত অনুগতা, বশ্যা ছিলেন। ১৭৮৮ সালে ক্রিশ্চিয়ানীর পুত্র জন্মাবার পরেও গ্যেটে তাঁকে বহুদিন কেবল মাত্র বাড়ীর কর্ত্রী করে রাখেন। ১৮০১ সালে গ্যেটের কঠিন ব্যাধির প্রাণপাত সেবার পরে গ্যেটের ভালবাসা প্রেমপাত্রীর অসম্মান মোচন করতে অবশেষে প্রস্তুত হল। ১৮০৬ সালে গ্যেটে ক্রিশ্চিয়ানীকে বিবাহ করেন। এই সময়ে 'ফাউষ্টের' প্রথমখণ্ড সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়।

'ফাউষ্টের' নায়িকা মার্গারেট দরিদ্র গৃহস্থকন্যা। ফাউষ্ট উচ্চ বংশীয়; শয়তানের ক্ষমতাশালী অসাধারণ ব্যক্তি। রাস্তায় ফাউষ্ট মার্গারেটকে দেখে বিচলিত হ'ন ও মেফেষ্টিফিলিসের সাহায্যে মার্গারেটকে বশীভূত করেন। মার্গারেটেরও ভাই ছিল। অলঙ্কার ও ঐশ্বর্যে ফাউষ্ট মার্গারেটকে প্রলোভিত করার চেষ্টা পান। অবশেষে ফাউষ্টের প্রেম মার্গারেটকে পুণ্য জীবন থেকে বিচ্যুতা ও অবৈধ প্রেমের গোপন উল্লাসে পথভ্রষ্টা করল। জননীকে হত্যা এবং অবাঞ্ছিত সন্তানের হত্যা এই মার্গারেটের ভয়াবহ পরিণতি। কারাকক্ষে শাস্তির জন্য আবদ্ধা মার্গারেটের সম্মুখে ফাউষ্ট উপস্থিত হয়েছেন, সঙ্গে তার মেফিষ্টিফিলিস। মার্গারেট ফাউষ্টের সঙ্গে পলায়নে অস্বীকৃতা, বধ্যভূমিতে স্বেচ্ছায় সে আত্মদান করবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য।

সুতরাং তার আত্মার মুক্তি আছে। এইখানে 'ফাউষ্টের' প্রথমখণ্ড শেষ।

দ্বিতীয়খণ্ডে ফাউষ্টের শেষ পরিণতির চিত্র। মানবের প্রেমের মধ্যে অবশেষে ফাউষ্টের আত্মার মুক্তির চিত্র। মেফিষ্টিফিলিস দেবদূতের বাহু থেকে ফাউষ্টের অমর অংশ গ্রহণ করতে পারল না। সমগ্র বইটির পটপাতে দেবাত্মাদের আনন্দকাকলি ধ্বনিত হয়ে উঠল :—

"Love for ever and for ever
Wins us onward still ascending."

প্রেম আমাদের অনন্তকাল উর্দ্ধে নিয়ে চলেছে, সে বিজয়ী। মার্গারেট উনা পেনটিটেন্টিয়াম নাম ধারণ করে আনন্দ সঙ্গীত গাইল : আমার প্রেম ফিরে এসেছে। নূতন দিনের আলোতে আমি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

নারীর প্রেম আত্মার নির্দেশক। প্রেম যে জীবনের মুক্তি, পবিত্রতার মধ্যে। গ্যেটের এই জীবনদর্শনে তাঁর সংগ্রাম ও মুক্তির চিত্র দেখা যায়। তিনিও বাসনা ও কামনার পঙ্কস্রোতের উর্দ্ধে অমৃতময় লোকে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে যে নারীদের কথা বলা হয়েছে, তাঁরা সকলেই 'ফাউষ্টের' নায়িকার উৎস। . সমগ্রভাবে সমস্ত প্রেমকাহিনী ও প্রেমিকাদের গ্রহণ করে উল্ফ্‌গ্যাংগ্‌ গ্যেটে যে জীবনদর্শনের বিষামৃত পান করেছেন, সেই জীবনদর্শনের কেন্দ্রীভূত বিন্দু মার্গারেট। কবির মনীষার শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই বন্দনীয়ার চরিত্রসৃজনে। পুরুষবন্ধুর প্রভাব, প্রেমিকার প্রেম 'ফাউষ্টের' রচনায় বহু অনুপ্রেরণা যোগালেও, কবিপত্নী ক্রিশ্চিয়ানীর সঙ্গেই প্রথমখণ্ডে মার্গারেটের সাদৃশ্য দেখি আমরা। যে প্রেম শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি ছিল, সেই প্রেম অবশেষে স্বীকৃতি পেল ক্রিশ্চিয়ানীকে গ্রহণের মধ্যে।' কবি গ্যেটে

মানুষ গ্যেটে হলেন। অসংখ্য লঘু প্রেমে আচ্ছন্ন দিন গ্যেটের দুই একটি নক্ষত্র অবশ্যই চিরজাগরুক আছে। কিন্তু, স্নিগ্ধ চন্দ্রপ্রভা ক্রিশ্চিয়ানী,—যে গ্যেটের কাছে কিছু চায়নি। নীরবে প্রেমের মধ্যে আত্মবিসর্জন তার ধর্ম। ১৮১৬ সালে গ্যেটের জীবন থেকে পত্নী চিরবিদায় গ্রহণ করেছিলেন। সে বিদায় একমাত্র মৃত্যু ভিন্ন কোন ক্ষমতার সাধ্যায়ত্ত ছিল না। অভিজাত-পরিবেষ্টিত, শতাব্দীর মনীষার শ্রেষ্ঠ বাহক গ্যেটের জীবনে কবি, শিল্পী, সুন্দরী অভিজাতা প্রেমিকার প্রাদুর্ভাব ছিল। কিন্তু এই সরলা দরিদ্রকন্যার চিত্রই যেন অমর কাহিনী 'ফাউষ্টের' পটভূমিকা আচ্ছন্ন করে জেগে থাকে। মার্গারেটও কিছু চায়নি, প্রেমিককে কখনও সে তিরস্কার করেনি। অত্যাচার, অপমান সহ্য করেও সে প্রেমিকের আত্মার মুক্তিকামনায় প্রাণ দিয়েছিল। সে প্রতীক্ষা করেছিল। তার প্রতীক্ষাই ফাউষ্টকে স্বর্গরাজ্যে অধিকার দিল। মার্গারেটের মতই নীরব প্রতীক্ষায় অন্য এক নারী গ্যেটেকে মনুষ্যত্বের অধিকার দিয়েছিল। নারীর প্রেমে আত্মার মুক্তি।—গ্যেটের সমগ্র মনীষার পূর্ণ বিকাশ মার্গারেট। মার্গারেট গ্যেটের জীবন দর্শন।

এমিলির মৃত্যুতে বন্ধুকে ঃ শারলতে ব্রণ্টে

সাহিত্যিক শুধু সজাগ মনের নির্দেশে রচনা-সৃজনে আপনার সত্তা পরবর্তী কালের কাছে রেখে দিয়ে যান না, জীবনের অন্যান্য মুহূর্তের প্রয়োজনেও তিনি অজ্ঞাতসারে আর এক সাহিত্যের সৃষ্টি করে থাকেন। পত্রসাহিত্য। বন্ধু বা পরিজনকে স্মরণ করে দৈনন্দিন লিপিরচনার অবকাশে কত সৃজন-লগ্ন লেখনীতে আবির্ভূত হয়, সে সমস্ত ইতিহাস অনেক গুণগ্রাহীর কাছেই অজানা থেকে যায়। নিজের চরিত্র বা পত্রে উল্লিখিত ব্যাক্তির চরিত্রেও নূতন আলোকপাত হয়, যদি আমরা স্মরণীয়দের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের সন্ধান পাই।

উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যগগনে দুইটি উজ্জ্বল তারকা উদিত হয়েছিল—শারলৎ ও এমিলি ব্রণ্টে। মধ্যবিত্ত ঘরের ধর্মযাজক পরিবারের দারিদ্র্যপীড়িতা দুইটি কন্যা। তবু বহু তারকাখচিত ইংরেজী সাহিত্যের আকাশে এই দুই ঔপন্যাসিকার প্রতিভার স্বাক্ষর আজও সগৌরবে বিদ্যমান।

শারলৎ ব্রণ্টে চমৎকার ও বহুল পত্ররচনা করে গেছেন—বন্ধু মিসেস্ গ্যাসকেল, মিস্ উলার ও এলেন নসিকে লেখা তাঁর বহু পত্রে নিজেদের জীবনী অজ্ঞাতসারে লিখে গেছেন। 'জেন আয়ারের' লেখিকা শারলৎ ছোটবোন এমিলিকে 'শার্লি' উপন্যাসে অমর করে রাখলেও বন্ধুকে লেখা তাঁর পত্রে এমিলির মৃত্যুকে বর্ণনাচ্ছলে— এমিলির অনেকখানিই জানা যায়। ভগ্নীর প্রতি শারলতের গভীর স্নেহ, সমস্ত বিপদের মধ্যেও ঈশ্বরকে সশ্রদ্ধ স্বীকার আমাদের চক্ষে

ঔপন্যাসিকার অন্য একটি দিক উন্মোচিত করে। এ ছাড়া সাহিত্যিক মূল্যেও এই পত্রখানি উল্লেখযোগ্য।

এমিলির অশান্ত প্রতিভা চার পাশের জগৎ আশ্রয় করে বিক্ষুব্ধ আত্মার অপূর্ব প্রকাশবাণীতে মুক্তিলাভ করেছিল। 'জেন আয়ার' আমরা গ্রহণ করতে পারি গুণমুগ্ধের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে, কিন্তু এমিলির 'Wuthering Heights', আমাদের চমকিত করে। বেদনার অশ্রু সেখানে শুষ্ক — দগ্ধ মরুভূমির সর্বহারা রিক্ততা বিয়োগ-বিচ্ছেদের কারুণ্যকে আবৃত করেছে। এমিলির উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতা ব্রাণওয়েলের জীবনের চিত্র। ছোটবোন অ্যান অসুস্থ, বাবার চোখের দৃষ্টি ক্রমেই চলে যাচ্ছে, শারলৎ উচ্চাশায় বিফলিত, বার্ণওয়েল দিক্‌ভ্রান্ত। তখনই এমিলির প্রতিভার পূর্ণবিকাশ—বন্য গুল্মলতার ছায়ায় হিথ্‌ফিল্ডের বন্য প্রেমের কাহিনী। অসংস্কৃত বেশা—কর্মভারে প্রপীড়িতা নিঃসঙ্গ তরুণীর অন্তর্নিহিত সত্তা ছিল দুঃসাহসী অভিযাত্রী। পরিশ্রমী, দৃঢ়চেতা, স্বাধীন বহিরূপের অগোচরে বন্দী আত্মার মর্মস্পর্শী বিলাপ শুধু এমিলির লিখবার ডেস্ক্‌টি জেনেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে মহিলা-লেখিকাদের বিস্ময়জনক নবচেতনার অগ্রদূত এমিলি ব্রণ্টে।

ঊনত্রিশ বয়সে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পূর্বেই ক্ষয়রোগের বীজাক্রান্ত এমিলি বিদায় গ্রহণ করল। ব্রাণওয়েলের মৃত্যুর গভীর শোক এমিলির কাশী ও শ্লেষ্মারোগকে দ্রুত মারাত্মক করে তুলল। তবু এমিলি রোগকে স্বীকার করেনি। নিজের প্রতিটি কাজ সে শেষদিন পর্যন্ত করে গেছে। ডাক্তারকে ডাকা নিষিদ্ধ হ'লেও স্নেহব্যাকুলা শারলৎ এমিলির অবস্থা বর্ণনান্তে যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই ঔষধ এমিলির জিহ্বাগ্র কখনও স্পর্শ করেনি। এমিলির মৃত্যু পলে

পলে এগিয়ে আসছে—পরিজনেরা সহ্য করতে পারছিলেন না—তবু এমিলি অবিচল। বসবার ঘরের টেবিলে ভর-দেওয়া অবস্থায় তার মৃত্যু হয়—রোগশয্যায় নয়। এমিলির জীবনীকার শ্রীমতী রবিন্‌সন্ আক্ষেপ করেছেন—"কোন প্রেম-মাধুর্য, যশের আস্বাদ, বিরামের সুখমুহূর্ত—ভাগ্য তোমার জন্য রাখেনি।—যে সমাধিতে তুমি চিরনিদ্রিত, সে সমাধির উপর শ্রদ্ধাদত্ত গোলাপগুচ্ছ বা লরেল তোমার স্মরণে আমরা রাখব না—শুধু চিরকাল তোমার জন্য যে বন্য-শুষ্ক হিদার ফুল ফুটেছে,—তাই তোমার স্মরণচিহ্ন হবে।"

শারলতের পত্রের স্থানে স্থানে এমিলির চরিত্রের যে বিশেষত্ব উল্লেখিত আছে, এমিলির সম্পর্কে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা তার প্রতিপাদ্য। এমিলির নির্ভীক দুঃসাহসী আত্মা মৃত্যুর পথযাত্রায় কারুর সহানুভূতি সম্বল চায়নি। তার শারীরিক যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট তার কাছে মানুষী দুর্বলতা মাত্র—যে রোগ তার মৃত্যুবাহক সে রোগের কাছে আত্মসমর্পণ যেন এমিলির পরাজয়। নিকট-আত্মীয়দেরও এ পরাজয় লক্ষ্য করা নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং কবি শারলৎ, ঔপন্যাসিক শারলতের নিশ্চেষ্ট পর্যবেক্ষণ এমিলির মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। এমিলি শারলতের যে কতখানি প্রিয় ছিল, বন্ধুদের লিখিত বিভিন্ন পত্রে সে পরিচয় আছে।

শারলৎ একখানি পত্রে এমিলির বিষয়ে বলেন, "যদিও অন্যের প্রতি সে করুণাশীল, এমিলির ভয়াবহ বিশেষত্ব তার নিজের প্রতি নির্মমতা। তার আত্মা দৈহিক প্রয়োজন স্বীকার করেনি।"
এমিলির শেষ কবিতা—

"No coward soul is mine,
No trembler in the world's
storm-troubled sphere ;

I see Heaven's glories shine,
And faith shines equal, arming
me from fear."

—আমার সত্তা কাপুরুষ নয়—পৃথিবীর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ ক্ষেত্রে সে কম্পিত নয়। আমি স্বর্গীয় দিব্যজ্যোতির সন্ধান পেয়েছি। বিশ্বাসও তেমনি জ্যোতির্ময়—ভীতি থেকে আমাকে রক্ষা করছে।

দিনের পর দিন মৃত্যুর অধিকার বিক্ষুন্ন করে নিজের স্বাভাবিক দিনযাত্রায় এমিলি ক্ষয়রোগাক্রান্ত দেহকে যে কৃচ্ছ্রসাধনে আরও নিস্তেজ করে আনছিল—চোখ মেলে চেয়ে দেখাও শারলতের শাস্তি ছিল। এমিলি রোগকে অস্বীকার করে দেহের উপরে তার দৃঢ় আত্মার বিজয় স্থাপনা করতে চেয়েছিল। তার দৈহিক যন্ত্রণা, লুপ্তপ্রায় শক্তি শারলৎ বা অন্য পরিজনের লক্ষ্য করাটাও যেন অপরাধ ছিল। চিকিৎসা সে করবে না—একগুঁয়েমিপূর্ণ দৃঢ়তার কাছে সকলেই নিরস্ত। নিরুপায় হতাশায় শুধু দেখে যাওয়া ভিন্ন শারলতের অন্য কিছু করবার ছিল না।

এমিলির মৃত্যুর পরে বন্ধুকে লেখা চিঠিখানির প্রতিটি ছত্রে মর্মান্তিক বেদনা ঘনীভূত হয়ে আছে। আমরা এখন সেই চিঠিখানি পড়ব। ২১শে ডিসেম্বর, ১৮৪৮ সালে মঙ্গলবারে এমিলির মৃত্যু হয়।

এখন আর এমিলি যন্ত্রণা বা দুর্বলতায় কষ্ট পাচ্ছে না। এই পৃথিবীতে আর সে কখনও কষ্ট পাবে না। সংক্ষিপ্ত কিন্তু কঠিন সংগ্রামের পরে সে চলে গেছে। যেদিন আমি তোমাকে চিঠি লিখেছি, ঠিক সেই মঙ্গলবারেই সে মারা গেল। আমি ভেবেছিলাম খুব সম্ভব সে আরও অনেক সপ্তাহ আমাদের মধ্যে থাকতে পারে,—কিন্তু মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা পরেই সে অনন্তের যাত্রী হ'ল। হ্যাঁ, এখন কালে বা পৃথিবীতে কোথাও এমিলি আর নেই। গতকাল আমরা তার ক্ষীণ-

দুর্বল নরদেহ নীরবে ধর্মমন্দিরের অঙ্গনে প্রোথিত করলাম। এখন আমরা বড় শান্ত। কেনই বা আমরা অন্যরূপ হ'ব? তার যন্ত্রণা দেখার সকরুণ বেদনা শেষ হয়ে গেছে। মৃত্যুযন্ত্রণার দৃশ্যও চলে গেছে। সৎকারের দিনটিও অতীত হ'ল। আমরা অনুভব করতে পারছি সে শান্তি পেয়েছে। নিষ্করুণ তুষার বা সুতীক্ষ্ণ বাতাস দেখে আর ভীতিকম্পিত হ'তে হয় না। এমিলি তো আর সে সব উপলব্ধি করতে পারছে না। উজ্জ্বল ভবিষ্যতের অঙ্গীকারের মধ্যেই এমিলি জীবন থেকে বিদায় নিল। তবু এতো ঈশ্বরেরই ইচ্ছা। যেখানে সে গিয়েছে সে স্থান তো তার পরিত্যক্ত স্থানের চেয়ে সুন্দরতর।

যে ব্যথা আমি পেলাম, তার তীব্রতা পূর্বে কল্পনাও করিনি—তবু বিস্ময় বোধ করি যে, ঈশ্বর কিভাবে আমাকে শক্তি দিলেন। এখন কেবল অ্যানের দিকে চেয়ে কামনা করি ও অন্ততঃ সুস্থ ও সতেজ হোক। কিন্তু সে তো দুটোর একটাও নয়—আমার বাবাও তাই। কয়েকদিনের জন্য এখন আসতে পার কি আমাদের কাছে? আমি তোমাকে বেশীদিন থাকবার অনুরোধ করব না। চিঠি লিখে জানাও যে আগামী সপ্তাহে কি আসতে পারবে—যদি পার কোন্ ট্রেনে আসবে? আমি তোমার জন্য কাইট্‌লিতে চেষ্টা করে একখানা গাড়ী পাঠাব। আমি বিশ্বাস করি, তুমি আমাদের প্রশান্তই দেখ্‌বে। একবার আসতে চেষ্টা ক'র। আমার জীবনে আর কখনও এত বেশী কোন বন্ধুর উপস্থিতির সান্ত্বনা প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য এই সাক্ষাৎকারে তোমার অন্য কোন আনন্দ নেই—শুধু তোমার কোমল হৃদয় অন্যের প্রতি দাক্ষিণ্যে যেটুকু আনন্দ তোমাকে দেবে, তাই মাত্র আছে।

ভবিষ্যতের হাতে এই পত্র রেখে গিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখিকা শারলট ব্রন্টে, তাই আজ আমরা তাঁর অসাধারণ

প্রতিভার অন্তরালে বেদনা-বিহ্বল একটি নারীমনের দেখা পাই। দুই বোনের প্রীতিবন্ধনের সাক্ষ্য এই পত্রখানি। এমিলির সংক্ষিপ্ত-অসুখী জীবনের এমন চিত্র দুই একটি কথার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে, যা অনেক জীবনীকার দীর্ঘ পুস্তক প্রণয়নেও ফোটাতে পারেননি। কারণ একমাত্র শারলতের কলমই এমিলির জন্য এমন করে লিখতে পারে—একরক্তে জাতা এক প্রতিভার অন্য প্রতিভার বিচ্ছেদের বিরহ যে মর্মস্পর্শী।

সারা ওয়াকার ও উইলিয়ম হ্যাজলিট

উইলিয়াম হ্যাজলিট প্রবন্ধকার ও চিত্রশিল্পী হিসাবে ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে পরিচিত। উগ্রমেজাজী, রুক্ষমূর্তি মানুষটির অন্তরের কোমল দিকগুলির সন্ধান নেবার পূর্বে অন্ততঃ তাঁর জীবনের পরিবেশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা প্রয়োজনীয়।

প্রায় সমস্ত মনীষীর বিশেষতঃ সাহিত্যিকের মন রমণীয় তারের যন্ত্রের মত। কোন রূপসীর করাঙ্গুলি দুর্লভ মুহূর্তে সেই সব তারে সহানুভূতির আঘাতে আঘাতে মধুর রাগিনীর জন্মদান করে। যেন ছিদ্রময় বেণুবন,—দক্ষিণা বাতাস ছিদ্রপথে প্রবেশ করে তবেই ধ্বনির উন্মেষ জাগায়। যেখানেই সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্যের সৃষ্টি দেখি, সেখানেই প্রেরণার উৎস প্রেম। সৃষ্টির আদি যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রতিভাশালীর জীবন-ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমন কত নারীর নাম লেখা আছে সোনালী অক্ষরে—কত ভিকটর হিউগোর কাহিনীতে কত ঈথেল, কত হ্যাজলিটের উপাখ্যানে কত সারা ওয়াকার! আমাদের কবি সত্যিই বলেছেন :—

> "তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে,
> বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে, তবে সে মর্মর ফুটে।
> জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি, যুগল মিলিয়াছে আগে
> যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা—সেখানে গান নাহি জাগে।"

যে প্রবল প্রেম-পিপাসা হ্যাজলিটকে দুইবার পরিণয়ে প্রবৃত্ত করেছিল, সেই অতৃপ্ত প্রেমলিপ্সা সারা ওয়াকারের পদপ্রান্তে ভিখারীরূপে উপনীত করেছিল ইংরাজী সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট

মনীষীকে। হ্যাজলিটের বিপুল প্রজ্ঞা, ক্ষুরধার মনীষা, তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ব্যর্থ হয়ে গেল পুষ্পধনুর একটি চপল শরক্ষেপে। অতিশয় নির্মম এই সমালোচকের মনের গোপনে একটি কক্ষ ছিল। যে হ্যাজলিটের নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি পরমবন্ধু চার্লস ল্যাম্বকেও ক্ষমা করেনি, সেই হ্যাজলিট সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করেছিলেন সারা ওয়াকারের কাছে। হ্যাজলিটের জীবন-চরিত অধ্যয়ন করলে তাঁর যা স্বরূপ দেখা যায়, উন্মাদ প্রেমের পক্ষে তা অনুকূল নয়। জীবনের প্রথম ভাগে নানা হতাশা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। কঠোর পরিশ্রমের ফল বহু ক্ষেত্রেই হতাশায় শেষ হ'ত। তাই চিত্রশিল্পী ও লিখনশিল্পী—দুইএর মধ্যে কিছুদিন যাবৎ দোলায়মান হয়ে হয়ে অবশেষে তিনি লেখক হলেন। কিন্তু তাঁর অব্যবস্থিত-চিত্ততার হেতুর অভাব ছিল না। তাই মন স্থির করা কঠিন হয়েছিল তাঁর পক্ষে।

হ্যাজলিটের স্বভাবে ছিল নির্ভীক সত্যান্বেষীর দৃঢ়, অনমনীয় স্পর্দ্ধা। তার শত্রু হয়েছিল অসংখ্য। বিভিন্ন পত্রিকায় হ্যাজলিটকে উদ্দেশ করে শত্রুপক্ষীয় লেখকবৃন্দ শর নিক্ষেপ করতেন। মিত্রপক্ষীয়েরাও দুঃখের সঙ্গে বলতেন, "হ্যাজলিট লোকটি বড়ই নটখটে" (difficult)। তবুও শত্রুপক্ষীয়দের আক্রমণ সময়ে সময়ে এতই হিংস্র ও ব্যক্তিগত হ'ত যে, হ্যাজলিটের মানসিক অশান্তি ও চিত্তের তিক্ততা বিস্ময়কর বোধ হয় না। জন্মাবধি হ্যাজলিট ছিলেন খিটখিটে মেজাজের একটি কড়া লোক। জীবনের ব্যর্থতা ও তিক্ততা নিঃসন্দেহে মেজাজ তাঁর আরও উগ্র করে তুলেছিল। তাছাড়া, হ্যাজলিটের কতকগুলি বাজে অভ্যাস ছিল, যথা ক্রমান্বয়ে কড়া চা খাওয়া। হ্যাজলিটের পরিপাক-শক্তি ক্ষীণ ছিল। জীবনীকার হাউয়ি বলেন, ক্রমান্বয়ে এই ভাবে কড়া চা খাওয়ার ফলে হ্যাজলিটের

হজমের দোষ হয়। অবশেষে সেই রোগ ক্যানসারে পরিণত হয়ে তাঁর মৃত্যুর কারণে দাঁড়ায়। সুতরাং নানাদিক বিবেচনা করে দেখলে হ্যাজলিটের স্বভাবে মাধুর্যের অভাব কেন ছিল বোঝা যায়।

হ্যাজলিট সুদর্শন ছিলেন না, পূর্বেই বলেছি। হ্যাজলিটের বিষয়ে এতক্ষণ আলোচনা করে যে ব্যক্তিকে পেলাম, তিনি প্রেম ভালবাসার ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই মনে হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-প্রখর প্রবন্ধগুলি পড়লে মনে হয়, সমগ্র জীবন তাঁর কেটেছে পুস্তকাগারের অবরুদ্ধ আবহাওয়ায় কিন্তু এই একই লোকের লেখনীই রচনা করে গেছে 'Liber Amoris'—গদ্যে লেখা এই পুস্তকটি প্রেমের প্রেরণায় কাব্যের রূপ নিয়েছে কঠোর প্রবন্ধকারের হাতে। যে হ্যাজলিট প্রথম সাহিত্যজীবন আরম্ভ করেন—"Project for a New Theory of Civil and Criminal Legislation" প্রবন্ধ দিয়ে, সেই হ্যাজলিট রচনা করে গেলেন প্রেমের অকপট প্রকাশের কাব্য। যে হ্যাজলিট "On living to One's Self" প্রবন্ধে বিদ্রূপাত্মক উন্নাসিকতায় লিখে গেছেন—"But let no man fall in love, far from that moment he is the baby of a girl", মাত্র দুই বছর পরে ১৮২৩ সালে তিনিই 'Liber Amoris' পুস্তকে লিখে গেলেন পরম উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, "I will pursue her with unrelenting love and sue to be her slave and tend her steps without notice and without reward," ইত্যাদি।

কে এই নারী? সুনিপুণ প্রবন্ধকারের প্রেরণার উৎস কে ছিলেন, জানবার ইচ্ছা পাঠকমাত্রেরই মনে জাগে। হ্যাজলিট দুইবার বিবাহ করেছিলেন, দুইবারই তিনি বিবাহে অসুখী হন ও অবশেষে বিচ্ছেদ ঘটে। প্রথমা পত্নীর নাম ছিল সারা স্টোডার্ট। তিনি হ্যাজলিটের

পরম বন্ধু ল্যাম্বের ভগ্নীর বান্ধবী ছিলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহ হয়। ইতিপূর্বে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে হ্যাজলিট লেক প্রদেশে একটি লঘু ও অবাঞ্ছিত হৃদয়-ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হয়েছিলেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বিবাহ অসুখের হওয়াতে স্বামী স্ত্রী পৃথক বাস করতে আরম্ভ করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এই বিবাহে বিচ্ছেদ হয়।

হ্যাজলিটের দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন একজন বিধবা, মিসেস ব্রিজওয়াটার। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই ধনবতী মহিলাকে বিবাহ করাতে হ্যাজলিটের অর্থকষ্ট কিছু পরিমাণে দূর হয়ে যায়। তিনি লেখাতে মন দিতে পারেন ও বিবাহের পবে দেশ ভ্রমণ করে চমৎকার আনন্দজনক কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, 'Notes on a Journey through France and Italy." ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে হ্যাজলিটের বিচ্ছেদ হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে হ্যাজলিট প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র অন্তিমশয্যার পাশে ছিলেন।

দুইপত্নী হ্যাজলিটের রচনার উপর বিশেষ কোন প্রভাব রেখে যাননি। হ্যাজলিট বিবাহ করেছিলেন সত্য, কিন্তু প্রেমে পাগল হয়ে নয়। একটি মাত্র নারীকেই তিনি উন্মাদের মত সর্ব্বগ্রাসী প্রেমে ভালবেসে গিয়েছিলেন। সেই নারী তাঁর লেখনীতে নূতন সুর এনে দিয়েছিল। তাব জন্য তিনি বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করে হাস্যাস্পদ হওয়াও অপমানজনক বোধ করেননি। এমন কি, নিজের হৃদয়ের প্রতিটি ভাবলহরী তিনি প্রকাশ্যে উন্মোচন করে জগতের সম্মুখে নিজের প্রেম-ইতিহাস নিজেই রচনা করে রেখে গেলেন। তাঁর প্রেম কি রকম ছিল, তাঁর প্রেয়সী তাঁকে কতটা প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, সম্যক প্রকাশ লেখা আছে 'Liber Amoris' এর ছত্রে ছত্রে।

এই নারী সারা ওয়াকার। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে হ্যাজলিটের প্রথমা পত্নীর

সঙ্গে পৃথক বাস আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে হ্যাজলিট সল্স্বেরির গ্রাম্য আবাস ত্যাগ করে ৯নং সাউথাম্পটন বিল্ডিংস্এ বাস করেন। এইখানে প্রথম গৃহকর্তার কন্যা সারার সঙ্গে হ্যাজলিটের সাক্ষাৎ হয়।

তরুণীর প্রতি হ্যাজলিটের গভীর প্রেম নানাভাবে প্রকাশ পায়। তিনি একান্তচিত্তে সারার ধ্যান কবেন ও বিবাহ-বাসনায় প্রথমা পত্নীর সঙ্গে আইনগত বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করবার উদ্দেশে স্কটল্যাণ্ডে যাত্রা কবেন। ফেব্রুয়াবী থেকে মে, চারমাসব্যাপি চেষ্টাব পরে জুন মাসে এডিনবারায় বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা শেষ হয়। এর মধ্যে ক্রমাগত হ্যাজলিটকে এই উদ্দেশে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করতে হয়েছিল। সাবাব সঙ্গে সাক্ষাতের তুই বৎসব পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে হ্যাজলিট বিবাহবন্ধন-মুক্ত হলেন সারা ওয়াকারের আশায়।

কিন্তু হায়, লঘুচিত্তা সারা! তিন মাসেব মধ্যেই জানা গেল, সারা হ্যাজলিটের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। ইংরাজি সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষীকে প্রত্যাখ্যান করে সারা অন্যকে হৃদয় দান করেছেন। হ্যাজলিটের বেদনার মাত্রা দেখে সাবার প্রতি তাঁব প্রেমের প্রগাঢ়তা ও আন্তরিকতা সম্বন্ধে তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। তিনি এতই মুহ্যমান হয়ে-পড়েন যে, বহুদিন যাবৎ তাঁর তৎপব লেখনী মূক হয়েছিল। তাঁর হিতৈষীবৃন্দ হ্যাজলিটের অবস্থা দেখে চিন্তিত হ'লেন। 'Liber Amoris' বইটি হ্যাজলিট এই সময়ে রচনা করেন। হতাশ প্রেমেব জীবন্ত প্রতীক হ্যাজলিটের 'লিবর্ আমোরি'। প্রেমের সমাধিতে অমর স্মৃতিমন্দির।

হ্যাজলিটের ক্ষীণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁর 'লিবর্ আমোরি' পুস্তকাকারে বাহির করা স্থির হ'ল, কারণ সারা ওয়াকারের ছবি তখনও লেখকের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। কিছুদিন পরে হ্যাজলিট আবার রচনাকার্যে

মন দিতে সক্ষম হলেন ও তাঁর গ্রাম্য আবাসে ফিরে গেলেন। সারা ওয়াকারের প্রেমে আচ্ছন্ন চিত্ত নিয়ে তিনি 'Characteristics' নামে একখানি উদাহরণতথ্যের বই লিখেছেন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে। তারও মাঝে মাঝে বিফল প্রেমের চিহ্ন আছে।

যে হ্যাজলিট কঠোর, সেই হ্যাজলিট প্রেমিক। তাঁর চরিত্রে এ উপাদান ছিল। তাই প্রবন্ধকারকে দেখি রং-তুলি নিয়ে ছবি-আঁকায় মত্ত। হ্যাজলিটের পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। ধর্মের প্রতি পিতার অনুরাগ হয়তো পুত্রের জীবনে দেখা দিয়েছিল সারা ওয়াকারের প্রতি দুর্বার প্রেমের রূপে।

হ্যাজলিট সারাকে হারাবার পরে নিঃসঙ্গজীবন গ্রহণ করেননি সত্য, কিন্তু, তিনি যে কত ভালবেসেছিলেন তার সাক্ষী 'Liber Amoris'. সারা ওয়াকার তাঁকে যে প্রেরণা দিয়েছিলেন, তার অমর নিদর্শন হ্যাজলিট রেখে গেছেন সাহিত্যে। হৃদয়রক্তে লেখা হ্যাজলিটের গদ্য-কাব্য। প্রেম যে তৃতীয় নয়ন উন্মিলীত করে, তাতেই প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়ে। হ্যাজলিটের মনোমন্দিরে যে শোভনাঙ্গী প্রেয়সী বিরাজ করতেন, যিনি মিউজের মত হ্যাজলিটকে অনুপ্রেরিত করে তুলেছেন; যাঁর কোমল করস্পর্শে বীণার মত হ্যাজলিটের মনের তার বেজে উঠেছিল; নীরস নিরপেক্ষ সমালোচনার মধ্যে তাঁকে টেনে আনবার কি প্রয়োজন? সেই নারী হৃদয়হীনা হোন বা চপলা হোন, তাঁর বিচার করবে কে? যে নারী মনীষীকে, শিল্পীকে প্রেরণা দেন, তিনি মহিয়সী। তাঁর প্রেমিক যথার্থই লিখেছেন—
I will make a Goddess of her and build a temple to her in my heart, and worship her on indestructible altars—"

আমি তাকে দেবীজন্ম দেব, আমার হৃদয়ে তার দেউল নির্মিত হ'বে অমর বেদীপীঠে আমি তার বন্দনা করে যাব—('লিবর্ আমোরি')।

পাথরে-গড়া পুরী হ্যাজলিটের রচনাবলী, সেই পাথরের ফাঁকে বিকশিত হয়ে উঠেছিল প্রেমের রক্তগোলাপ। হ্যাজলিটের জীবনে এই পুষ্পশোভা যাঁর প্রসাদে, সেই সারা ওয়াকারকে আমরাও বন্দনা করি।